ধীরেন্দ্র মজুমদার

নক্সী তালিম

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি কলিকাতা

নঈ তালিম

ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার

অনুবাদক
বিমলচন্দ্র পাল

॥ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি ॥
॥ ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২ ॥

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৪

দাম : দুই টাকা

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
হইতে প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস
(প্রাইভেট) লিঃ ১৫এ, ক্ষুদিরাম বোস রোড,
কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

বাঙ্গলা সংস্করণের ভূমিকা

রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও যাবতীয় শিক্ষাব্রতী থেকে আরম্ভ করে পথে-ঘাটের নাগরিক পর্যন্ত সকলেই আজ প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির অকার্যকারিতা সম্বন্ধে দিবা-রাত্র আলোচনা করে থাকেন। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে কোন্ বিকল্প পদ্ধতি কার্যকারী, তার সুস্পষ্ট হদিস কেউ দিতে পারছে না। এ অবস্থা কেবল দুঃখজনক নয়, আশ্চর্যের বিষয়ও বটে। কারণ বর্তমান যুগের দ্রষ্টা পুরুষ রাষ্ট্রপিতা মহাত্মা গান্ধী প্রথম থেকেই দেশের কাছে শিক্ষার বিষয়ে যুগোপযোগী পরিকল্পনা দিয়ে গেছেন। গান্ধীজীর বৈপ্লবিক বিচারধারা বাস্তবিকপক্ষে তাঁর শিক্ষাদর্শ—নঈ তালিমেই বিমূর্ত হয়েছে।

আজ সরকার দ্বারা বুনিয়াদী শিক্ষা নামে যা কিছু চালান হচ্ছে, তার মূলে সামাজিক বিপ্লবের বিচারধারার অভাব থাকার কারণ, তা বাঞ্ছিত সুফল প্রসব করছে না। কারণ, শিক্ষার উদ্দেশ্য এক বিশেষ ধরনের সমাজের নাগরিক সৃষ্টি করা। সামাজিক ধারণা অপরিবর্তিত রেখে নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রবর্তন করতে গেলে তা নিষ্ফল হবে—এতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

তাই নঈ তালিম অথবা বুনিয়াদী শিক্ষা চালাতে হোলে তার মূলগত বিচারধারা স্পষ্টভাবে বোঝা দরকার। নঈ তালিমের কয়েকটি ছাত্রীকে একদা গান্ধীজীর শিক্ষা-পরিকল্পনা বোঝাবার কালে যা কিছু আলোচনা

করেছিলাম, তা পুস্তকাকারে হিন্দীতে প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীমান্ বিমল এবার তার বঙ্গানুবাদ করেছে। এই পুস্তক পাঠে বাঙ্গলার শিক্ষা-শাস্ত্রানুরাগী পাঠকবৃন্দের মনে নঈ তালিম সম্বন্ধে আগ্রহ জাগলে নানা প্রকার প্রশ্ন উঠতে পারে। পাঠক সেই সমস্ত প্রশ্ন আমার কাছে পাঠালে নঈ তালিমের সবিশেষ উপকার করা হবে।

শ্রম ভারতী, পোঃ খাদীগ্রাম
মুঙ্গের, ভায়া জমুই, বিহার।

ধীরেন্দ্র মজুমদার

অনুবাদকের নিবেদন

গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শের উপর শ্রদ্ধেয় ধীরেনদার এই ভাষ্য হিন্দীতে রচিত হয়। গ্রন্থটির এ যাবৎ ছয়টি সংস্করণ হোয়েছে এবং বহু সহস্র পাঠক ধীরেনদার অনুপম শৈলীতে রচিত নবীন শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করেছেন। ধীরেনদা তাঁর গুরু গান্ধীজীরই মত কেবল তত্ত্ববেত্তা নন, তিনি কর্মীও বটেন। সুতরাং তাঁর বক্তব্য অভিজ্ঞতার আলোকে প্রোজ্জ্বল ও আত্মপ্রত্যয়ে ভাস্বর।

প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির কুফল শিক্ষায় অগ্রসর বঙ্গদেশে অত্যন্ত বিকট ভাবে পরিদৃশ্যমান। একদিকে শিক্ষিত বেকারের ক্রমবর্ধমান হাহাকার এবং অন্যদিকে কেবল কতকগুলি তথ্য মুখস্থ করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষিত আখ্যাধারী অথচ প্রত্যুত সমাজ-কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে অপ্রয়োজনীয় যুবশক্তি আজ চিন্তাশীল প্রতিটি ব্যক্তির মনেই এক মহা জিজ্ঞাসারূপে সমুত্থত। একমাত্র গান্ধীজী-প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তনে অর্থাৎ শিক্ষা-ক্ষেত্রে আমূল বিপ্লব সংসাধন করলে এই দ্বিবিধ সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে সামাজিক ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। বুদ্ধির গর্বকারী বাঙ্গলাদেশকে এই সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন করতে এবং সময় থাকতে যথার্থ পন্থা গ্রহণ করার মত সৎসাহসের পরিচয় দিতে ধীরেনদার যুক্তি-তর্ক ও বিশ্লেষণী শক্তি সহায়তা দেবে বলে মনে হয় এবং সেই আশাতে অনুপ্রাণিত হোয়েই এই গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ করেছি।

আমার দুই অগ্রজ সম সহকর্মী শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে অনুবাদ করার কাজে সবিশেষ সহায়তা পেয়েছি। এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টি ভবানীদারই অনুবাদ। এই প্রসঙ্গে তাঁদের ঋণ স্বীকার করছি। প্রখ্যাত প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান 'ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি'র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক মহাশয় গ্রন্থটি প্রকাশ করে আমার এবং তাবৎ শিক্ষানুরাগী বাঙ্গালীর ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪।

বিমলচন্দ্র পাল

সূচীপত্র

বুনিয়াদী শিক্ষার দৃষ্টিকোণ—বুনিয়াদী শিক্ষা কেন ব্যাপক হইতে পারে নাই—বুনিয়াদী শিক্ষার বেশে পুরাতন শিক্ষা—বিনোবার ভয়—বিহারে বুনি াদী শিক্ষার পরিণাম—একাঙ্গী গুণগ্রহণ—বুনিয়াদী শিক্ষা খেলনা হইয়া রহিয়াছে—জাতীয় অর্থনীতির প্রভাব—সরকারের অর্থনৈতিক কাঠামো ও বুনিয়াদী শিক্ষা—সমাজ-জীবনের ভ্রান্ত ধারণা—নূতন মানব-সৃষ্টি—নিরাশার কারণ—প্রয়োগের প্রারম্ভ—সমগ্র গ্রাম-সেবার ভূমিকা—শোষণহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠার বিপ্লব—স্তর নিম্ন করায় ত্যাগ এবং প্রকৃতি পরিবর্তনে বিপ্লব—নব মানবরূপী শিবের প্রতিষ্ঠা—গান্ধীজীর আহ্বান—গঠনমূলক কার্যক্রম জড়বৎ হইল কিরূপে—প্রতিষ্ঠান ও কর্মীদের হয়রানী—নবনির্মাণের জন্য বিসর্জন—একাঙ্গী উৎসাহ—গ্রামোদ্যোগ ও বুনিয়াদী শিক্ষা, উভয়েই পঙ্গু—বুনিয়াদী শিক্ষার সংগঠন।

নঈ তালিম সম্বন্ধে গান্ধীজীর মত

[নঈ তালিম বা বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে গান্ধীজীর কয়েকটি উক্তি নীচে দেওয়া হচ্ছে]

১

বুদ্ধি-বিকাশ বনাম বুদ্ধি-বিলাস

ত্রিবাংকুর এবং মাদ্রাজ ভ্রমণের সময় ছাত্র এবং বিদ্বান ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে আমার এরূপ মনে হয় যে, তাঁদের বুদ্ধি-বিকাশ না হয়ে বুদ্ধি-বিলাস হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাও আমাদের বুদ্ধি-বিলাসের শিক্ষা দেয় এবং বুদ্ধিকে বিপরীত দিকে পরিচালিত করে তার বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয়। সেগাঁও-তে থেকে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করছি তা আমার এই মন্তব্যের পূরক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আমি এখনও এখানে আমার নিরীক্ষা-কার্য চালিয়ে যাচ্ছি। এইজন্য এই প্রবন্ধে ব্যক্ত বিচারধারা এ সকল অভিজ্ঞতার উপর আধারিত নয়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন ফিনিক্স নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করেছিলাম তখন থেকেই আমার মনে এবম্বিধ বিচারধারা চলে আসছে।

বুদ্ধির প্রকৃত বিকাশ হস্ত, পদ, কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্যক ব্যবহার থেকেই হতে পারে। অর্থাৎ শরীরের সজ্ঞান অনুশীলনের দ্বারাই অতি দ্রুত বুদ্ধির সর্বোত্তম বিকাশ হয়। তবে এর সঙ্গে যদি পরমার্থিক বৃত্তির মিলন না হয় তবে বুদ্ধির বিকাশ একাঙ্গী হয়ে থাকে। পরমার্থিক বৃত্তি হৃদয় অর্থাৎ আত্মার ক্ষেত্রে। অতএব একথা বলা যেতে পারে যে, বুদ্ধির প্রকৃত বিকাশের জন্য আত্মা এবং শরীরের বিকাশ যুগপৎ এবং একই গতিতে হওয়া প্রয়োজন। যদি কেউ বলেন যে, এই দুই বৃত্তির একটির

পর একটির বিকাশ হতে পারে, তবে তা উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে ভ্রমাত্মক প্রতীয়মান হবে।

হৃদয়, বুদ্ধি এবং দেহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান না হওয়ার ফলে সৃষ্ট দুঃসহ পরিণাম আমাদের সামনে রয়েছে। কিন্তু আমাদের ভ্রান্ত স্বভাবের জন্য আমরা তা দেখতে পাই না। গ্রামের লোকেদের পালন পোষণ পশুদের মধ্যে হওয়ায় তারা নিজ শরীরের ব্যবহার কেবল যন্ত্রের মতই করে থাকে। বুদ্ধিকে তারা কাজে লাগায় না বা লাগাতেও হয় না। হৃদয়ের শিক্ষা তাদের মধ্যে নাই বল্লেই চলে। এইজন্য তাদের জীবন কোন গতিকে কেটে যাচ্ছে। ফলে তাদের জীবন না এদিকের, না ওদিকের হচ্ছে। পক্ষান্তরে আধুনিক অর্থাৎ কলেজী শিক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই যে, সেখানে বুদ্ধি-বিকাশের নয় বুদ্ধি-বিলাসের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। লোকে মনে করেন যে, বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে শরীরের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু শরীরের জন্য ব্যায়াম তো অত্যাবশ্যক। সেইজন্য অপ্রয়োজনীয় ব্যায়াম দ্বারা এই কার্য সাধনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা হয়ে থাকে। অথচ চার দিক থেকে ক্রমাগত এমন সব প্রমাণ পাচ্ছি যে, স্কুল-কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা মজুরদের সমান শ্রমসাধ্য কাজ করতে পারে না। অল্প একটু পরিশ্রম করলেই তাদের মাথা ব্যথা সুরু হয়ে যায় এবং রৌদ্রে একটু ঘুরতে হলেই মাথা ঘোরা সুরু হয়ে যায়। এ অবস্থা স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। পতিত জমিতে যেমন ঘাস জন্মে, তেমনি হৃদয়ের সংস্কারগুলিও স্বতঃই প্রস্ফুটিত ও বিলুপ্ত হয়। এই দশাকে দৈন্যাবস্থা না মনে করে প্রশংসনীয় মনে হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে বাল্যাবস্থা থেকে যদি শিশুদের হৃদয়বৃত্তিসমূহকে সঠিক পন্থায় চালিত করা যায়, তাদের কৃষি, চরখা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কার্যে নিযুক্ত করা যায় এবং যে-শিল্প দ্বারা তাদের শরীর খুব সুগঠিত ও দৃঢ় হতে পারে, সেই সকল শিল্পের উপকারিতার জ্ঞান এবং যে-কার্য পরিচালনার

জন্য আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুত-প্রণালী যদি তাদের শেখান যায়, তবে সহজেই তাদের বুদ্ধির বিকাশ হতে পারে এবং প্রতিদিন তার পরীক্ষাও হতে থাকবে। এই সকল কার্য করার সময় গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি যে সকল জ্ঞানের আবশ্যক অনুভূত হবে তার জ্ঞান তাদের দিতে হবে এবং চিত্ত-বিনোদনের জন্য সাহিত্য প্রভৃতির জ্ঞানও দিতে থাকলে তিনটি বিষয়ই তুল্যভাবে চলতে থাকবে এবং তাদের কোন অঙ্গ অপুষ্ট থাকবে না। মানুষ, কেবল বুদ্ধি বা কেবল শরীর নয়, অথবা কেবল হৃদয় বা আত্মাও নয়। এই তিনের সম-বিকাশই মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। এর মধ্যেই প্রকৃত অর্থশাস্ত্র বিদ্যমান। উপরিউক্ত পদ্ধতিতে যদি এই তিনের বিকাশ যুগপৎ চলতে থাকে তবে আমাদের কঠিন সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যাবে। এই রকম চিন্তা করা অথবা তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা স্বাধীনতা লাভের পরেই হতে পারবে এ ধারণা করা ভুল। কোটি কোটি মানুষকে এই জাতীয় কার্যে নিযুক্ত করতে পারলেই স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিন ত্বরান্বিত হতে পারবে।

হরিজন সেবক, ১৭-৪-৩৭

২

উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষা

বহু দিন যাবৎ আমি একটি নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির আবশ্যকতা অনুভব করছিলাম। কারণ আমি জানতাম যে, আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা হতে প্রত্যাবর্তনান্তে যখন বহুসংখ্যক ছাত্র আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসত, তখনই এ বোধ আমার হয়। এইজন্য আমি আশ্রমে হস্তশিল্পের শিক্ষা প্রবর্তন করে এর প্রারম্ভ করেছিলাম। হস্তশিল্পের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল সন্দেহ নাই। পরিণামে হস্তকর্মের শিক্ষায় বালকদের অরুচি এসে যায় এবং তাদের মনে এই

ধারণা হয় যে, তাদের পুঁথিগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এটা তাদের ভুল ধারণা ছিল; কারণ এই নূতন শিক্ষা-পদ্ধতিতে তারা যে জ্ঞান অর্জন করেছিল, তা পুরাতন পদ্ধতির স্কুলে প্রাপ্ত জ্ঞান অপেক্ষা বহুল পরিমাণে অধিক ছিল। পক্ষান্তরে ইহা আমাকে এ বিষয়ে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, উদ্যোগিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পুঁথির শিক্ষা নয়, বরং উদ্যোগিক শিক্ষার মাধ্যমেই পুঁথির শিক্ষা দেওয়া দরকার। এরূপ করলে তারা উদ্যোগিক শিক্ষাকে এক হীন শ্রম বলে মনে করবে না এবং পুঁথির শিক্ষাতেও একটি নূতন তৃপ্তি এবং নূতন প্রয়োজন অনুভূত হবে। কংগ্রেস শাসনভার গ্রহণ করার পর আমার মনে হল যে, এই অভিজ্ঞতাকে দেশের সামনে রাখা দরকার এবং আনন্দের বিষয় এই যে, অনেক জায়গায় একে অভিনন্দিত করা হয়েছে।

আমি স্থির করেছিলাম যে, ইংরাজীকে পাঠ্যক্রম থেকে বর্জন করা দরকার। কারণ আমি জানতাম যে, ছেলেদের অধিকাংশ সময় ইংরাজী শব্দ ও বাক্য মুখস্থ করতে চলে যায়। তবুও তারা যা শেখে তা নিজেদের ভাষায় প্রয়োগ করতে পারে না আর শিক্ষক যা শেখায় তাও ঠিক ঠিক বুঝতেও পারে না। পক্ষান্তরে, নিজেদের মাতৃভাষাকে সরাসরি উপেক্ষা করার জন্য তা ভুলে যায়। আমার এরূপ মনে হয় যে, হস্তকর্মের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করলে এই দুই ত্রুটির প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যেতে পারে।

যদি আমাকে শিক্ষাদানকার্য আরম্ভ করতে হয় তবে আমি এই করব: ছেলেরা আমার কাছে আসবে, সর্বপ্রথম আমি এই দেখব যে তাদের বুদ্ধি কতদূর বিকশিত হয়েছে। তারা লিখতে পড়তে পারে কি না বা অল্প এক-আধটু ভূগোলের জ্ঞান তাদের আছে কিনা? তারপর আমি তাদের তকলী চালাতে দিয়ে তাদের জ্ঞান বাড়াবার চেষ্টা করব।

আপনারা আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, এত সব হস্তশিল্প থাকা

সত্ত্বেও কেন আমি তকলীকেই বেছে নিলাম? কারণ, সর্বপ্রথম আমি যে সকল হস্তশিল্পের অনুসন্ধান করেছিলাম তাদের মধ্যে তকলীও একটি এবং ইহা বহু যুগ হতে চলে আসছে। অতীত কালে আমাদের সর্বপ্রকার কাপড়-চোপড় তকলীর সূতাতেই তৈরী হত। চরখা তো পরে এল। এদিকে অধিক সূক্ষ্মপ্রকৃতির সূতা তো চরখাতে কাটাই যেতে পারে না। এইজন্য পুনরায় আমাকে তকলীর আশ্রয় নিতে হল। তকলী মানুষের আবিষ্কারের বুদ্ধিকে এত উঁচুতে উঠিয়ে দিয়েছে যে, সেখানে মানুষ আগে কদাপি উপনীত হতে পারেনি। এতে আঙ্গুলের কর্মকুশলতার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার হয়েছে। পরন্তু তকলী এমন মিস্ত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে যারা কখনও শিক্ষা লাভ করেনি। এইজন্য এর ব্যবহার প্রায়ই লুপ্ত হয়ে গেছে। যদি আমরা তকলীকে উদ্ধার করে আবার তাকে সগৌরবে পূর্ববর্তী স্থানে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই, যদি আমাদের গ্রাম্য জীবনের পুনরুদ্ধার এবং পুনর্নির্মাণ করতে হয়, তবে আমাদের ছোট ছেলেদের শিক্ষারম্ভ তকলী দিয়েই করা উচিত।

এইজন্য দ্বিতীয় পাঠ এই হবে যে, এরপর ছেলেদের আমি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তকলীর স্থান কি ছিল তা শেখাব। এরপর আমি তাদের এর কথঞ্চিৎ ইতিহাস বলে দেব এবং একথাও বলে দেব যে, কিরূপে এর পতন হল। তারপর ভারতবর্ষের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সুরু করব। এর সূত্রপাত হবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কিংবা তারও একটু আগে থেকে, অর্থাৎ মোগল বা পাঠান আমল থেকে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ধনভাণ্ডার স্ফীত করার জন্য কিভাবে আমাদের দেশকে শোষণ করা হয়েছে এবং আমাদের এই মুখ্য হস্তশিল্পকে কিভাবে সজ্ঞানে গলা টিপে শেষপর্যন্ত একেবারে খতম করা হয়েছে, তা তাদের বিস্তৃতভাবে জানাব। এরপর তকলী সম্বন্ধীয় যন্ত্রবিদ্যা এবং তার প্রস্তুত-প্রণালীর সংক্ষিপ্ত পাঠ্যক্রম চলবে। প্রারম্ভে হয়ত মাটি অথবা আটাকে ছোট

গোল গোল তৈয়ারি করে তাকে শুকিয়ে এবং তার ঠিক মাঝখানে বাঁশের শলাকা দিয়ে তকলী তৈয়ারি করা হত। বিহার এবং বাংলার কোন কোন অংশে আজও এই প্রকার তকলী দেখা যায়। এরপর মাটির গোলার স্থান ইটের চাকতী দখল করে নেয়। এখন তো ইটের চাকতির জায়গায় লোহা, ইস্পাত এবং পিতলের চাকতি এসে গেছে এবং বাঁশের শলাকার জায়গায় ইস্পাতের শলাকা এসে গেছে। এখানেও আমরা অনেক প্রয়োজনীয় প্রশ্নের আলোচনা করতে পারি—যেমন, চাকতি এবং তারের মাপ এতটাই কেন রাখা হয়েছে? এর থেকে বেশী বা কম নয় কেন? এরপর কাপাস সম্বন্ধে বলা হবে। যেমন, কাপাসের চাষ সাধারণতঃ কিরূপ জমিতে করা হয়, কত প্রকারের কাপাস হয়, কোন্ কোন্ দেশে এবং ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ স্থানে কাপাসের চাষ হয় ইত্যাদি। কাপাসের চাষ সম্বন্ধে এবং তার জন্য কিরূপ জমি সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত হতে পারে, এ সম্বন্ধেও কিছু কিছু জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে। এর দ্বারা চাষবাস সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান হবে।

আপনারা দেখতে পাবেন যে, ছাত্রদের এই জাতীয় শিক্ষা দেওয়ার আগে শিক্ষককে যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করতে হবে। যত তার সূতা কাটা হয়েছে তা গজে ব্যক্ত করা, সূতার নম্বর বের করা, গুণ্ডী তৈয়ারি করা, বুনাইএর জন্য সেগুলিকে তৈয়ারি করা, কাপড়ের অমুক বুনাইএর জন্য কত গজ সূতা লাগবে প্রভৃতি বিষয় দ্বারা সম্পূর্ণ প্রারম্ভিক গণিত শিখান যেতে পারে। কাপাসের অঙ্কুরোদ্গম থেকে সুরু করে বুনাই পর্যন্ত—কাপাস বাছা, বীজ ছাড়ান, ধুনাই, কাটাই, মাড় লাগান, বুনাই—প্রভৃতি প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত যন্ত্রশাস্ত্র, ইতিহাস এবং গণিত আছে।

এর প্রধান লক্ষ্য এই যে ছেলেদের যা কিছুই শেখান হ'ক না কেন, তার মাধ্যমে যেন তাদেরও পুরাপুরি শারীরিক, বৌদ্ধিক এবং আত্মিক শিক্ষা দেওয়া যায়। সংশ্লিষ্ট শিল্পের যাবতীয় প্রক্রিয়া দ্বারা আপনাকে

ছেলেদের মধ্যে যেসব সদ্‌গুণ আছে তার বিকাশ করতে হবে। এ ছাড়াও আপনি ইতিহাস, ভূগোল ও গণিত সম্বন্ধে যা কিছু জানাবেন তার সব কিছু সেই শিল্পের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হওয়া দরকার। ছেলেদের এরূপ শিক্ষা দেবার পরিণামে শিক্ষা স্বাবলম্ব হবে। কিন্তু সফলতার মানদণ্ড তার স্বাশ্রয়ী রূপ নয়, বরং এই দেখে সফলতার অনুমান করতে হবে যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষা দ্বারা মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয়েছে কিনা? আমি এরূপ অধ্যাপককে কখনও রাখব না যিনি যে কোন পরিস্থিতিতে শিক্ষাকে স্বাশ্রয়ী করে দেওয়ার আশ্বাস দেবেন। ছাত্ররা স্বয়ং নিজ কার্যে শক্তির সম্যক সদ্ব্যবহার করে নিতে পারলে তবে শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করার ন্যায়সিদ্ধ পরিণাম আখ্যা দিতে হবে। কোন ছেলে যদি প্রতিদিন তিন ঘণ্টা শ্রমশিল্প-দ্বারা কোন কাজ করে নিশ্চিতপূর্বক নিজের জীবিকা অর্জন করতে পারে, তাহলে যিনি নিজে বিকশিত বুদ্ধি এবং আত্মা নিয়োগ করে এই কাজ করবেন, তিনি কতই না বেশী অর্জন করে নেবেন!

হরিজন সেবক, ১১-৬-৩৮

৩

নঈ তালিমের অভিনবত্ব

এই শিক্ষা-মন্দিরকে এমন এক বিদ্যালয়ে পরিণত করতে হবে যে, এর ফলে আমরা যেন স্বাধীনতা অর্জন করতে পারি এবং আমাদের সকল (এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিবাদ অন্তর্ভুক্ত) দোষ-ত্রুটির চির-সমাধি করতে পারি। এর জন্য আমাদের অহিংসার উপর সমগ্র মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে। হিটলার এবং মুসোলিনীর স্কুলের মূল উদ্দেশ্য ছিল হিংসা। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে কংগ্রেসের আদর্শ অনুযায়ী অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন। অতএব আমাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান অহিংসাত্মক উপায়েই করতে হবে। আমাদের গণিত, ইতিহাস এবং বিজ্ঞানকে আমরা অহিংসার

দৃষ্টিতেই দেখব এবং এই সব বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যাবলী অহিংসার রঙেই রঞ্জিত হবে। তুরস্কের সুপ্রসিদ্ধ নারী-নেত্রী বেগম হালিদা হানুম যখন জামিয়ামিলিয়া ইস্লামিয়াতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তখন আমি বলেছিলাম যে, এ যাবৎ ইতিহাস রাজা এবং তাঁদের যুদ্ধের বর্ণনামাত্রে পর্যবসিত ছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে যে ইতিহাস রচিত হবে তা হবে মানবতার ইতিহাস। সেই ইতিহাস অহিংসারই ইতিহাস হওয়া সম্ভব আর হবেও তাই। অতঃপর আমাদের শহরের উদ্যোগ ছেড়ে গ্রামোদ্যোগের প্রতি সমগ্র দৃষ্টি আরোপ করতে হবে। অর্থাৎ যদি আমরা আমাদের সাত লক্ষ গ্রামকে জীবিত রাখতে চাই, তাহলে আমাদের সমস্ত গ্রামোদ্যোগের পুনরুদ্ধার করতে হবে। এছাড়া আপনারা স্থির ভাবে জেনে রাখুন যে এই সকল শিল্পের মাধ্যমে যদি শিক্ষা দিতে পারেন, তাহলে আমরা এক বিপ্লব আরম্ভ করতে পারব। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমাদের পাঠ্য পুস্তক রচনা করতে হবে।

আমি যে অহিংসা চাই তা কেবল ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। আমি চাই যে, এই অহিংসা আমাদের যাবতীয় আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন এবং সমস্যার উপরও যেন প্রযুক্ত হয়। হিন্দু ও মুসলমানদের ভিতর যখন প্রাণবন্ত ঐক্য সৃষ্টি হবে, তখনই প্রকৃত ও সক্রিয় অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলতে হবে। হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিজনিত ভয়ের উপর আধারিত একতা আমাদের কাম্য নয়।

হরিজন সেবক, ৭-৫-৩৮

নঈ তালিমের অভিনবত্ব বোঝা আবশ্যক। পুরান শিক্ষা-পদ্ধতির ভাল অংশ তো নূতন শিক্ষা-পদ্ধতিতে থাকবেই; কিন্তু এতে এর অতিরিক্ত বহু নূতনত্বও থাকবে। নঈ তালিম যদি প্রকৃতপক্ষে নূতনই হয়, তবে তার পরিণাম এরূপ হওয়া প্রয়োজন যে, আমাদের মধ্যে যে নিরাশা আছে তার

স্থানে যেন আশার সঞ্চার হয়, দারিদ্র্যের পরিবর্তে সমৃদ্ধি পরিদৃষ্ট হয়। বেকার থাকার পরিবর্তে থাকবে কর্মব্যস্ততা, বাদ-বিসম্বাদের পরিবর্তে ঐক্য এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা লিখতে পড়তে জানার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-কথাও শিখবে। এই শিল্পকর্মের মাধ্যমে তারা অক্ষয় জ্ঞান অর্জন করবে।

হরিজন সেবক, ২৮-১-৩৯

একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, নঈ তালিম ছাড়া ভারতবর্ষের কোটি কোটি বালককে শিক্ষা দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব। এইজন্য গ্রাম-সেবকের অবশ্যই নঈ তালিমের জ্ঞান থাকা দরকার। তাকে নঈ তালিমের শিক্ষক হওয়া চাই। এই শিক্ষা-পদ্ধতির পশ্চাতে প্রৌঢ় শিক্ষাও স্বাভাবিকরূপে এসে যাবে। যেখানে নঈ তালিম তার ঘর নির্মাণ করে নেবে, সেখানে ছেলেরাই পিতামাতার শিক্ষক হয়ে যাবে। যাই হোক, গ্রাম-সেবকের মনে বয়স্কদের শিক্ষা দেওয়ার আগ্রহ থাকা দরকার।

হরিজন সেবক, ১৭-৮-৪০

৪

নূতন বিশ্ববিদ্যালয়

আজকাল দেশে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা করার জোয়ার এসেছে। গুজরাটের গুজরাতী ভাষার জন্য, মহারাষ্ট্রের মারাঠী ভাষার জন্য, কর্নাটকের কানাড়ী ভাষার জন্য, উড়িষ্যার উড়িয়া ভাষার জন্য, আসামের আসামী ভাষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় আবশ্যক। আমার মনে হয় যে এই সব সমৃদ্ধিশালী প্রাদেশিক ভাষাসমূহ এবং ঐ সব ভাষা-ভাষী লোকদের পূর্ণ মাত্রায় উন্নতি সাধন করতে হলে অবশ্যই এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার। তবে আশঙ্কা হয় যে, এই আদর্শকে কার্যান্বিত করার জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করা হচ্ছে। এর জন্য সর্বপ্রথম ভাষা-

ভিত্তিক প্রদেশ গঠন করা আবশ্যক এবং তাদের শাসনব্যবস্থা পৃথক হওয়া প্রয়োজন। বোম্বাই প্রদেশে গুজরাটী, মারাঠী এবং কন্নাড় তিন প্রকার ভাষার ব্যবহার হয়। মাদ্রাজ প্রদেশে তামিল, তেলেগু, মলয়ামী এবং কন্নাড় এই চার প্রকার ভাষা প্রচলিত আছে। অন্ধ্রের একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। অল্পদিন হ'ল এর জন্ম হয়েছে। কিন্তু এর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে বলা চলে না। অনামলী বিশ্ববিদ্যালয় মূলতঃ তামিল ভাষার জন্য—একথা বলা যেতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি না যে এর ফলে তামিল ভাষার পুষ্টি হচ্ছে বা তার গৌরব বাড়ছে।

নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন। একে দৃঢ়মূল করার জন্য এরূপ স্কুল এবং কলেজ হওয়া দরকার, যা নিজ নিজ প্রাদেশিক ভাষার ভিত্তিতে শিক্ষাদান করে। তখনই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সম্যক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বলে স্বীকার করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় সর্বোচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র। কিন্তু যদি তার ভিত্তি দৃঢ় না হয় তবে তার উপরে বৃহৎ অট্টালিকার দৃঢ় শিখর দাঁড় করানর আশা রাখা যেতে পারে না।

যদিও আমরা রাজনৈতিক দৃষ্টিতে স্বাধীন, তথাপি পাশ্চাত্ত্যের প্রভাব থেকে আমরা এখনও মুক্তি লাভ করতে পারিনি। যাঁরা একথা বিশ্বাস করেন যে, পাশ্চাত্ত্যেই সমস্ত কিছু আছে এবং সব রকম জ্ঞান ঐ দেশ থেকেই পাওয়া যেতে পারে, তাঁদের প্রতি আমার কিছু বক্তব্য নাই। অবশ্য আমি একথাও বিশ্বাস করি না যে পশ্চিম থেকে আমরা কিছু ভাল জিনিস পেতেই পারি না। সেখানে কি ভাল আর কি মন্দ আছে, তা বুঝবার মত প্রগতি আজও আমাদের হয়নি। বিদেশী শাসনের হাত থেকে মুক্ত হয়েছি বলে যে বিদেশী ভাষা ও বিদেশী বিচারধারার প্রভাবমুক্ত হয়েছি একথা এখনও বলা চলে না। নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা করার পূর্বে কথঞ্চিৎ স্থির হয়ে নব প্রাপ্ত স্বাধীনতার জীবনপ্রদায়িনী আলোকের পরিপ্রেক্ষিতে নূতনভাবে কিছু চিন্তা করা কি যুক্তিশীল মন ও দেশমাতৃকার প্রতি কর্তব্যের পরিচায়ক নয়?

কেবল অর্থ বা বড় বড় অট্টালিকা হলেই বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন সর্বাধিক আবশ্যক। এর জন্য সুযোগ্য শিক্ষকের প্রয়োজন। এদের প্রতিষ্ঠাতাদের অত্যন্ত দূরদর্শী হতে হবে।

আমার মতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার জন্য অর্থের সংস্থান করা গণতান্ত্রিক সরকারের কাজ নয়। জনসাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে চাইলে তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও তাঁরা দেবেন। জনসাধারণের অর্থে স্থাপিত বিশ্ব-বিদ্যালয় দেশের শোভা বর্ধন করবে। যে-দেশের রাজকার্য বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত হয়, সেখানকার সবকিছু উপর থেকেই চাপান হয়ে থাকে এবং এইজন্য লোকে পরাধীন বা গোলাম হয়ে যায়। জনসাধারণের রাজ্যে সব কিছু নিচের থেকে উপরে উঠে এবং সেইজন্য উহা স্থায়ী ও মনোরম হয় এবং লোকশক্তির বৃদ্ধি ঘটায়। উর্বর ক্ষেত্রে উপ্ত বীজ যেমন দশগুণ অধিক ফসল দেয়, তেমনি বিদ্যার উন্নতি মানসে ব্যয়িত অর্থও অনেকগুণ অধিক ফলদায়ক হয়। বিদেশী শাসনের মারফত প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ এর বিপরীত কার্য করছে।

অবশ্য এর অন্যবিধ পরিণাম হতেও পারত না। এইজন্য ভারতবর্ষ নবলব্ধ স্বাধীনতাকে সুষ্ঠুভাবে পরিপাক না করা পর্যন্ত নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা করতে আমার বড় ভয় হয়।

এছাড়া, হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ এরূপ ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করেছে যে, তার ফলে আজ পূর্বাহ্নে একথা বলা মুস্কিল যে এর শেষ কোথায়? ধরুন, যদি এরূপ অলৌকিক ঘটনা ঘটে যে ভারতবর্ষে কেবল হিন্দু ও শিখ এবং পাকিস্তানে কেবল মুসলমান থাকে, তবে আমাদের শিক্ষা বিষাক্ত রূপ ধারণ করবে। হিন্দু, মুসলমান এবং অন্য ধর্মাবলম্বীরা ভারতবর্ষে ভ্রাতৃভাবে বস-বাস করলে স্বভাবতঃই আমাদের শিক্ষা সৌম্য এবং সুন্দর রূপ ধারণ করবে। আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনসাধারণ সখ্যতা ও ভ্রাতৃত্বসূত্রে আবদ্ধ

হয়ে বসবাস করে আসার নিমিত্ত যে সম্মিলিত সুন্দর সভ্যতা গড়ে উঠেছে, হয় তাকে দৃঢ় এবং সুন্দর করে তুলতে হবে, অথবা আমাদিগকে এরূপ সময়ের অন্বেষণ করতে হবে যখন ভারতবর্ষে কেবল হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাই বাস করত। এরূপ সময় হয়ত ইতিহাসে খুঁজেই পাওয়া যাবে না। কিন্তু এরূপ যুগের সন্ধান যদিও পাওয়াই যায় এবং আমরা যদি তার অনুসরণ করার প্রয়াস করি, তাহলে আমরা কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে যাব এবং পৃথিবী আমাদের হেয়ভাজন করবে ও নিন্দা করবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা ইতিহাসের মোগলযুগের কথা ভুলে যাওয়ার বৃথা চেষ্টা করি তবে আমাদের পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট দিল্লীর জুম্মা মসজিদকেও ভুলে যেতে হবে অথবা আলিগড়ের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়কেও ভুলে যেতে হবে। তাহলে আমাদের পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম আগ্রার তাজমহল, অথবা মোগল আমলে নির্মিত দিল্লী এবং আগ্রার বড় বড় দুর্গকেও বিস্মৃত হতে হবে। তখন আমাদের এই দৃষ্টিকোণ থেকে নূতন করে ইতিহাস লিখতে হবে। বাস্তবে বর্তমান পরিস্থিতি এরূপ নয় যাতে এই সম্বন্ধে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারা যায়। দু' মাসের স্বাধীনতাকে আমরা এখন গড়তে আরম্ভ করেছি। শেষ পর্যন্ত এ কি রূপ ধারণ করবে তা আমরা জানি না। যে পর্যন্ত আমরা সঠিকভাবে একথা জেনে নিতে না পারি ততদিন বড় বেশী হলে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কার্যবিধির যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন করতে পারি এবং প্রচলিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্বাধীনতার প্রাণবায়ু সঞ্চার করতে পারলে তাকেই যথেষ্ট বলতে হবে। এইভাবে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হবে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে তা আমাদের সাহায্য করবে।

এখন বুনিয়াদী শিক্ষার কথা আসছে। আট বৎসর হ'ল এই শিক্ষা-পদ্ধতির প্রারম্ভ হয়েছে। এই জন্য এর রূপায়ণকালে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তা আমাদের প্রবেশিকা শ্রেণীর আগে নিয়ে যায় না। পরন্তু যাঁরা এই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োগে লিপ্ত আছেন, তাঁদের মনের মধ্যে বুনিয়াদী

শিক্ষার বিকাশ হয়েই চলেছে। যে প্রতিষ্ঠানের পিছনে আট বৎসরের পরিপক্ক অনুভব বিদ্যমান, তার সুপারিশকে কোন শিক্ষাব্রতী উপেক্ষা করতে পারেন না। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এই বুনিয়াদী শিক্ষা দেশের পরিবেশেই সৃষ্ট এবং এদেশের প্রয়োজন পূর্তি করতে সক্ষম। এই পরিস্থিতি ভারতের সাত লক্ষ গ্রামে এবং এই সকল গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ীর গ্রামীণ লোকেদের মধ্যে ছেয়ে আছে। তাদের ভুললে আপনারা ভারতবর্ষকেও ভুলবেন। সত্যকার ভারতবর্ষ শহরে নেই, এই সাত লক্ষ গ্রামেই বিরাজিত। শহর বিদেশী শাসনের প্রয়োজনীয় পূর্তির জন্য স্থাপিত হয়েছিল। আজও ঐগুলি আগেকার মতই টিকে আছে। কারণ বিদেশী শাসন ভারতবর্ষ থেকে লুপ্ত হয়েছে কিন্তু তার প্রভাব এখনও পূর্ববৎ বর্তমান আছে—এত তাড়াতাড়ি তা যেতেও পারে না।

এই নিবন্ধটি আমি নূতন দিল্লীতে বসে রচনা করছি। এখানে বসে বসে গ্রামের কথা কি আর ভাবতে পারি? যে নিয়ম আমার জন্য, সেই নিয়ম আমাদের মন্ত্রিমণ্ডলের উপরও প্রযোজ্য হওয়া উচিত। এইটুকু পার্থক্য আছে যে, তাঁদের উপর এই নিয়ম যেন বিশেষরূপে প্রযোজ্য হয়।

এখানে বুনিয়াদী শিক্ষার বিশেষ বিশেষ আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

১। সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা স্বাবলম্বী হবে; অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত পুঁজি ত্যাগ করে সমস্ত খরচ নিজের উপার্জনে করা উচিত।

২। এতে শেষ পর্যায় পর্যন্ত হাতের পূর্ণ ব্যবহার করা হবে; অর্থাৎ ছাত্ররা স্বহস্তে কোন না কোন শিল্পকার্য শেষ ক্লাস পর্যন্ত করবে।

৩। ছাত্রদিগকে সমস্ত শিক্ষা তাদের প্রাদেশিক ভাষায় দেওয়া উচিত।

৪। এতে কোন সম্প্রদায়গত ধর্মশিক্ষার স্থান থাকবে না। কিন্তু মৌলিক নীতিশিক্ষার জন্য যথেষ্ট সুযোগ থাকবে।

৫। ছোট ছেলে অথবা বড়, পুরুষ অথবা স্ত্রী, যেই গ্রহণ করুক না কেন, শিক্ষা ছাত্রদের ঘরে ঘরে পৌঁছাবে।

৬। যেহেতু এই শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ছাত্র নিজেকে সমস্ত ভারতবর্ষের নাগরিক বলে মনে করবে, সেই হেতু তাদের একটি আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা শিখতে হবে। সমস্ত দেশের এই একটি ভাষা নাগরী অথবা উর্দুতে লেখা যায় এমন হিন্দুস্থানী ভাষাই হতে পারে। এইজন্য ছাত্রদেরকে দুটি লিপি ভাল করে শিখতে হবে।

এই মূল বিচার ছাড়া অথবা একে উপেক্ষা করে যে সব নূতন বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করা হবে, তাতে আমার মতে দেশের কোন লাভ হবে না, বরং ক্ষতি হবে। এইজন্য সমস্ত শিক্ষাব্রতী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, নূতন বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগে কিছুদিন অপেক্ষা করে বিচার-বিবেচনা করা আবশ্যক।

হরিজন সেবক, ২-১১-৪৭

নঈ তালিম

গান্ধীজী সন ১৯২১ থেকেই গঠনমূলক কাজকে তাঁর সমগ্র বৈপ্লবিক পরিকল্পনার আধার রূপে গণ্য করেছিলেন। সর্বপ্রথম যখন তিনি স্বাধীনতা-আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তখন তাঁর প্রারম্ভিক কার্যক্রম ছিল, (ক) ৩০শে জুনের মধ্যে দেশে ২৫ লক্ষ চরখার প্রচার করা, (খ) কংগ্রেসের এক কোটি সদস্য করা এবং (গ) তিলক-স্বরাজ্য-ফাণ্ডের জন্য এক কোটি টাকা সংগ্রহ করা। এইরূপে তিনি একদিকে স্বাধীনতা-আন্দোলনকে দেশের সম্মুখে রেখে সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের দ্বারা স্বাধীনতা-আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন, অপর দিকে তার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার গঠনমূলক কাজের দ্বারা এই আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান ভিত্তিকে দৃঢ়মূল করার কাজও করে যাচ্ছিলেন।

"নঈ তালিমের" জন্ম

এইভাবে গান্ধীজী ক্রমশঃ চরখা, গ্রামোদ্যোগ, হরিজন সেবা প্রভৃতি গঠনমূলক কার্যকে রূপায়িত করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করতে লাগলেন। এই সকল গঠনমূলক কাজকে সুসংহত রূপ দেওয়ার জন্য তিনি চরখা সংঘ, গ্রামোদ্যোগ সংঘ, হরিজনসেবক সংঘ প্রভৃতি সংস্থার স্থাপনা করেন। অবশেষে ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের হাতে শাসনের দায়িত্বভার আসে; তিনি বুঝলেন যে, দেশ এখন স্বরাজ প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রায় উপনীত হয়েছে। এইবার তিনি দেশের সামনে নঈ তালিম বা নবীন শিক্ষারূপী তাঁর সর্বশেষ পরিকল্পনা পেশ করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, প্রকৃত স্বরাজ অর্জন করতে হলে বা সেই স্বরাজ রক্ষা করতে হলে নঈ তালিমকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হবে। দেশের স্বাধীনতার অর্থ

জনসাধারণের স্বাধীনতা। জনসাধারণের প্রকৃত স্বাধীনতা স্থাপনা করতে হলে দেশের সাত লক্ষ গ্রামের সমস্ত স্ত্রী-পুরুষকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা প্রত্যক্ষরূপে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্বাবলম্বীও হতে হবে। কারণ, কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রের উপর নির্ভর না করে স্বতন্ত্রভাবে দেশ রক্ষা করার ক্ষমতা তাদের থাকা চাই। এইরূপে প্রথম কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীর স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে দেশে নঈ তালিমের জন্ম হয়।

নঈ তালিমের উদ্দেশ্য

গান্ধীজী দেশকে যে সব কার্যক্রম দিয়েছিলেন তার মধ্যে নঈ তালিম সর্বাধুনিক ও চরম বৈপ্লবিক। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে এ একটি বিশেষ চিন্তনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আচার্য কৃপালনী নঈ তালিমের সম্বন্ধে যে পুস্তক লিখেছেন তার নাম হচ্ছে "The latest fad" বা 'সর্বশেষ বাতিক'। বইখানি ইংরাজীতে লিখিত এবং ইংরাজীনবিশ লোকেদের কাছে গান্ধীজীর গঠনমূলক কার্যক্রম মাত্রই পাগলামী। কিন্তু গান্ধীজী তাঁর ধ্যান ও দৃষ্টি অনুসারে দেশকে গড়তে চেয়েছিলেন। শিক্ষাই দেশনির্মাণের মূল সাধন। দেশ আর সমাজকে একটি সুনিশ্চিত পথে পরিচালিত করার জন্যই শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন হয়। অতএব নঈ তালিমের আদর্শ এবং তার রূপরেখা হৃদয়ঙ্গম করতে হলে একথা জানা প্রয়োজন যে, এই শিক্ষার পিছনে গান্ধীজীর কি উদ্দেশ্য ছিল এবং এর দ্বারা তিনি পৃথিবীকে কোন ধাঁচে গড়তে চেয়েছিলেন। বস্তুতঃ পৃথিবীতে এ যাবৎ শিক্ষার যে সকল পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের পিছনে নিশ্চয়ই বিশেষ এক ধরনের সামাজিক, আর্থিক বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার অভিলাষ এবং তার অনুকূল নাগরিক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ছিল। নঈ তালিমের পিছনেও সম্ভবতঃ গান্ধীজীর এই অভিপ্রায় ছিল।

মেকলে সাহেবের ইংরাজী শিক্ষা-পদ্ধতি এবং ভারতীয় বাবুসমাজ

প্রাচীনকালে যখন ভারত, মধ্য এশিয়া এবং রোম প্রভৃতি দেশে ধর্ম-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা সংগঠিত হয় তখন সেই সকল দেশের শিক্ষা-পদ্ধতিও বাঞ্ছিত ব্যবস্থার অনুকূল ছিল। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ-প্রধান বর্ণাশ্রম প্রথার আধারে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার জন্য ব্রহ্মচর্যাশ্রমের যে শিক্ষা চলত তাতে সমগ্র শিক্ষার গতি-প্রকৃতি এইরূপ ছিল যাতে আশ্রম-জীবনোত্তর ছাত্র সমাজে অনুকূল স্থান পেতে পারে। সেই রকম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রাক্কালে মেকলে যখন বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন তখন ভারতে এক বিশেষ ধরনের বাবুরূপী ক্রীতদাস সম্প্রদায় সৃষ্টি করার প্রয়োজন ছিল। এই অভিপ্রায়ের দ্বারা চালিত হয়ে তিনি স্বীয় শিক্ষা-পদ্ধতির কাঠামো রচনা করেন। তিনি চাইতেন যে, ভারতবর্ষে এমন কিছু ইংরাজী সংস্কারসম্পন্ন লোক হবে যারা ইংরাজশাসনের উপাঙ্গস্বরূপ কাজ করবে। এদের মধ্যে কোন মৌলিক বুদ্ধির বিকাশ হতে পারবে না এবং তার পরিণামস্বরূপ যেন তাদের ভিতর দেশগঠনকার্যের প্রেরণা, প্রবৃত্তি অথবা যোগ্যতার সমাবেশ হতে না পারে। এইরূপে তিনি ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা দেশে বাবু এবং সাহেবদের এমন এক সমাজ তৈরী করেন যারা কেবল কায়িক পরিশ্রম দ্বারা কিছু করতে অসমর্থই ছিল না, উপরন্তু তারা হস্তপদ দ্বারা কোন কিছু করাকে অপমানজনক বলে মনে করত। অধিকন্তু তারা বিদেশী সংস্কৃতি তথা বিদেশী মনোভাব পোষণকে সম্মানজনক প্রবৃত্তি বলে মনে করত। আজ ভারত থেকে ইংরাজ চলে যাওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের মনোবৃত্তি দেখে মেকলে সাহেবের সফলতা স্পষ্টরূপে প্রতীত হচ্ছে।

ইংরাজী শিক্ষার মারাত্মক পরিণাম

এইভাবে মেকলের শিক্ষাপদ্ধতি দেশের প্রাচীন গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং অন্যদিকে নবীন শিক্ষা-সংস্থাগুলির কেন্দ্রীকরণ করে নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে শিক্ষাকে ব্যয়বহুল করে তুলল। এর ফলে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ সেই শিক্ষা হতে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হল। এইভাবে পরিকল্পনাপূর্বক সাধারণ দেশবাসীকে দুইভাগে বিভক্ত করা হল। এক দল হাত-পা থাকা সত্ত্বেও পঙ্গু, অকর্মণ্য ও নিষ্ক্রিয় এবং অপর দল বুদ্ধিহীন, নির্বোধ এবং মাত্র শরীর-শ্রমের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ দেশে দুই প্রকার জীব সৃষ্ট হল। এদের মধ্যে একদল নির্বোধ এবং অপর দল পঙ্গু। চেষ্টা এই ছিল যাতে দেশে মানুষ নামক কোন প্রাণী না থাকে। কারণ, মানুষ তাদেরই বলা হয় যারা প্রকৃতির অবদান বুদ্ধি এবং শরীর উভয়ের পূর্ণমাত্রায় সঞ্চালনের দ্বারা উভয়েরই সম্যক্ বিকাশসাধন করতঃ সমাজ-সেবায় উভয়ের পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করে। মূল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ভারতবাসী স্বয়ং যেন কিছু করতে না পারে এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চিরকাল নির্বিঘ্নে চলতে পারে।

শিক্ষা-পদ্ধতির উদ্দেশ্য

আজকালকার বড় বড় শিক্ষাব্রতী এবং জননায়ক বর্তমান শিক্ষার তীব্র নিন্দা করে বলে থাকেন যে, প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি দেশবাসীদের নপুংসক করে দিয়েছে ; কিন্তু তাঁদের এ কথা চিন্তা করা উচিত যে যাঁরা চিরকাল ভারতের উপর আধিপত্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে চলতেন, তাঁদের পক্ষে কি কদাপি এমন ভ্রান্তি করা সম্ভব যে এদেশের যুবকদের জন্য এ জাতীয় শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন করেন, যার দ্বারা তারা সত্যকার বীর্যবান পুরুষ হয়ে দুই-দিনেই ইংরেজ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাবে ? এইরূপে প্রত্যেক যুগে আর প্রত্যেক দেশে এক নির্দিষ্ট প্রকার সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপনা ও পরিচালনার জন্য

বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শিক্ষা-পদ্ধতির সৃষ্টি হয়। অতএব গান্ধীজীর পক্ষে নিজ কল্পনানুসারে নবীন সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপনার জন্য এমন এক নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি আবিষ্কার করা অনিবার্য হয়ে পড়েছিল যার দ্বারা দেশে ও বিশ্বে তৎকল্পিত সমাজ-বিপ্লব সফল হতে পারে। সুতরাং প্রথমে আমাদের একথা বোঝা দরকার যে, গান্ধীজী ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের মাধ্যমে বিশ্বে কিরূপ সামাজিক, আথিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে অভিলাষী ছিলেন। কারণ এ-ছাড়া নঈ তালিমের মৌলিক আদর্শকে আমরা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারব না।

(১)
রাজনৈতিক আধার

এ যুগ রাজনীতির যুগ। প্রতিটি বিষয়কে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে দেখা আজ মানুষের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং গান্ধীজী দেশে কিরূপ রাজনৈতিক কাঠামো রচনা করার অভিলাষী ছিলেন প্রথমে তা বিচার করা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়েও বিবেচনা করা দরকার যে, গান্ধীজী ভাবী সমাজের যে কল্পনা করেছেন তা কি ইতিহাসের সম্পর্কবর্জিত একটি অলস কল্পনা মাত্র? অথবা তাঁর সমগ্র বিচারধারা মানবতার বিকাশপথের আর একটি ধাপ?

অবতার ও মহাপুরুষ

যুগে যুগে মানুষ তার সুখ, শান্তি আর স্বাতন্ত্র্যের জন্য যে প্রয়োগ এবং প্রচেষ্টা করে আসছে, তা ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের একটি যোগসূত্র বিশেষ। বস্তুতঃ সমাজে যে সব নবীন পরিকল্পনা রচিত হয়, তা পুরাতন প্রয়োগের পরিণাম এবং অতীত অভিজ্ঞতার কারণেই হয়ে থাকে। কোন অবতার বা মহর্ষি অহেতুক কোন কথা বলেন না। আসলে পৃথিবীতে এ যাবৎ যত মহর্ষি

এবং অবতারের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁদের সমাজের সামগ্রিক ইচ্ছাশক্তির প্রতিমূর্তি বলেই মনে করা উচিত। অবতার স্বর্গে অবস্থানকারী কোন ঈশ্বরের মানবীয় রূপ নয়; পক্ষান্তরে তাঁরা হচ্ছেন সমস্ত মানবসমাজের উচ্চতর আশা-আকাঙ্ক্ষার অবতার। এইজন্য তাঁরা সমাজের অভিজ্ঞতা-রাজির পরিধির বাহিরে যেতে পারেন না। তাঁরা মানবসমাজের অতীত পরীক্ষার জন্য দৃষ্ট সমস্যার সমাধান কল্পে মর্ত্যধামে জন্মগ্রহণ করেন।

জীবের মূল চেষ্টা

সুতরাং গান্ধীজী কিরূপ সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপনা করতে ইচ্ছুক ছিলেন, সে কথা বুঝতে হলে মানুষ আদিকাল হতে তার সমস্ত সমস্যা সমাধান করণার্থ যে প্রযত্ন করে আসছে তার ইতিহাসও জানতে হবে। মানব-ইতিহাসে আদিকালে যখন কোন প্রকার সামাজিক সংগঠন ছিল না, তখন মানুষ প্রকৃতি-মাতার কোলে একাকী বিচরণ করত। সেই সময় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করাই ছিল মানুষের প্রধান কাজ। কারণ সৃষ্টিকে ব্যাপক ভাবে অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, নিজের অস্তিত্ব কায়েম রাখার চেষ্টা করা জীবমাত্রের মূল প্রবৃত্তি। প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে এও লক্ষ্য করি যে, প্রত্যেক জীব নিজ প্রচলিত অবস্থাকে নিজের শরীরের মধ্যে অবিকৃত রাখতে চায়। জীবিত থেকে যতক্ষণ নিজ স্থিতিকে অবিকৃত রাখা যায়, জীব সেই চেষ্টায় তন্ময় হয়ে থাকে। তদনন্তর নিজের স্থিতিকে তারা সন্তানরূপে কায়েম রাখার চেষ্টা করে। অতএব আমরা বলতে পারি যে, মানব-সৃষ্টির প্রারম্ভিক অবস্থায় নিজেকে জীবিত রাখার জন্য সাধন সামগ্রী সংগ্রহ করাই হয়ত তার অন্যতম প্রমুখ কার্য ছিল। বিশাল ভূখণ্ডে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করার সময় মানুষ হয়ত এ কাজ করত। পরে সম্ভবতঃ জন-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যখন এই সাধন-সামগ্রী সংগ্রহকালে এক ব্যক্তির চেষ্টার সঙ্গে অপরজনের চেষ্টার সংঘর্ষের

সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। এই ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় আর তার ফলস্বরূপ হিংসার সৃষ্টি হওয়াও স্বাভাবিক ছিল। **পরিণামে এই হল যে, জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগী সাধন সংগ্রহের ক্রিয়ায় মানুষ পরস্পরের উপর হিংসার প্রয়োগ দ্বারা নিজের বিনাশ করা আরম্ভ করল।** জনসংখ্যা স্বল্প থাকায় হয়ত ধ্বংসের অবকাশ কম ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসের সুযোগ তাড়াতাড়ি আসতে আরম্ভ করে এবং শেষে একদিন এই সংঘর্ষ এত ব্যাপক হয় যে, মানুষের কাছে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখা এক সমস্যাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। জীবন রক্ষার চেষ্টাই মানব-জীবনকে বিপদে ফেলে তারপর প্রকৃতির ধর্ম অর্থাৎ স্বীয় স্থিতিকে বজায় রাখার চিন্তা নবরূপে উপনীত হল। মানুষ দেখল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সংঘর্ষ ও হিংসাকে সীমাবদ্ধ না করা যাবে বা তার নিয়ন্ত্রণ না হবে, ততক্ষণ নিজেকে কায়েম রাখাও কঠিন হবে। সেই সময় থেকে মানব-সমাজ হিংসার উপর বিজয়ী হবার জন্য বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুরু করে।

কেন্দ্রবাদের প্রারম্ভ

ভাগবতে কথিত আছে যে, যখন মর্ত্যবাসী মৎস্যন্যায়ের ফলে অতিষ্ঠ হয়ে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে মানব-সমাজের বিপদের কথা বলে তখন ব্রহ্মা মানব-সমাজের রক্ষার্থ মনুকে পৃথিবীতে রাজারূপে প্রেরণ করেন। ভাগবতের কাহিনী সম্ভবতঃ রূপকের আকারে বিশেষ এক পরিস্থিতির পরিচায়ক। বস্তুতঃ মানুষ যখন দেখল যে পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে সমগ্র সমাজ বিলুপ্ত হতে চলছে, তখন মানুষ তার হাত থেকে বাঁচার জন্য উপায়ানুসন্ধান করতে আরম্ভ করে এবং সমাজ-ব্যবস্থার এক নূতন প্রয়োগ আরম্ভ হয়। অর্থাৎ সহযোগিতামূলক সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সঞ্চালনমূলক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করা হল। ফলস্বরূপ তাকে নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে চালাবার জন্য একজন মোড়লের জন্ম হল। লোকে ভাবল

যে, যদি তারা নিজেদের ভিতর থেকে অল্প অল্প শক্তিসংগ্রহ করে সেই মিলিত শক্তিকে একজনের উপর ন্যস্ত করে তবে সেই ব্যক্তিবিশেষরূপে শক্তিশালী হয়ে বাকী সকলকে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারবে। আর অন্ততঃ সেই গণ্ডীটুকুর মধ্যে মানুষের হিংসা সীমাবদ্ধ হয়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। এইভাবে মানুষ প্রথমতঃ শান্তি, শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাজতন্ত্র সৃষ্টি করে। এইখান থেকেই কেন্দ্রবাদের প্রারম্ভ হয়।

শাসকবর্গ এবং শোষণ

একথা স্পষ্ট যে এই "কেন্দ্রীয় মানব" অর্থাৎ রাজা সামান্য জনসাধারণ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও মর্যাদাশালী ছিল। তাদের চালচলন দেখে তাদের এক বিশেষ ও ভিন্নশ্রেণীর মানুষ বলে গণ্য করা হত। এইভাবে সমাজে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক শ্রেণী (রাজন্যবর্গ) ও জনসাধারণ—এই দুটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। কালক্রমে রাজার বংশবৃদ্ধি হয়। প্রকৃতির মূলপ্রবৃত্তি অর্থাৎ অবিকৃতভাবে নিজ-স্থিতি বজায় রাখার প্রবৃত্তি রাজন্যবর্গের এই সকল সন্তানদের মধ্যেও হওয়া স্বাভাবিক ছিল। এদিকে ব্যবস্থা বা শাসন-ক্ষেত্রে আরও অধিক ব্যক্তিকে স্থান দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। অতএব নিজের অধিকার কায়েম রাখার জন্য তাদের অন্য ক্ষেত্র অধিকার করতে হয়। সমাজে উচ্চপদে আসীন থাকতে হলে শাসনক্ষেত্র ছাড়া আর্থিক ক্ষেত্রই তার উপযুক্ত স্থান। অতএব এইসব রাজন্যবর্গীয়েরা আর্থিকক্ষেত্রে লেনদেন দ্বারা উপার্জন করার এমন সূত্র খুঁজে বার করলেন, যাতে নিজের শ্রম ছাড়াও উৎপাদন হতে পারে। এইরূপে শাসকেরা নিজেদের শ্রেণীকে বিস্তৃত করে সমাজের আর্থিক ক্ষেত্রেও নিজেদের স্থান করে নেয়। ফলে মানুষ নিজেদের রক্ষার অন্য যে বিশেষ কেন্দ্রীত শক্তির (রাজন্যবর্গের) সৃষ্টি করেছিল, সেই কেন্দ্রীত শক্তি রাজনৈতিক এবং আর্থিক এই দুই ক্ষেত্রে তাদের আধিপত্য স্থাপন করে, এবং সেইজন্য

জন-সাধারণের স্বাতন্ত্র্য লাভের আন্দোলন রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে আর্থিক ক্ষেত্রে বিস্তৃত হতে পারেনি।

ইতঃপূর্বে রাজ-সন্তান শব্দটির প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যত অনুৎপাদক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে সকলেই রাজন্যবর্গের বংশজাত সন্তান। তবে তাদের সৃষ্টি রাজকার্যের সুবিধার্থই হয়েছিল। রাজাকে সাহায্য করার জন্য আমলা বা ব্যবস্থাপকদের সৃষ্টি হয়। অতঃপর রাজবংশ, ব্যবস্থাপক বংশ প্রভৃতি বহু অনুৎপাদক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। উৎপাদন না করে উপভোগ করার সুযোগ খোঁজা তাদের কাজ ছিল। বহুবিধ কাজ-কর্ম ও ব্যবসায়ের প্রবর্তন করে তারা নিজেদের উপযোগী সুযোগ আবিষ্কার করে নিল। কোন বস্তুর জন্ম হলে স্বাভাবিক ভাবেই তার প্রসার হয়--এই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। রাজকার্য চালনার অজুহাতে সৃষ্ট অনুৎপাদক শ্রেণীর সম্প্রসারণ হয়ে এমন বিশাল আকার ধারণ করল যে মানবসমাজে শাসন এবং শোষণের এক সংকটপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব হয়। সুতরাং অবিলম্বে পুনরায় এমন দিন এল যখন মানুষ সুখ এবং শান্তি লাভের জন্য যে কেন্দ্রীত শক্তি বা রাজার সৃষ্টি করেছিল, তাদেরই বিরোধ করতে সুরু করল। যে হিংসাকে তারা কেন্দ্রশক্তির দ্বারা সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছিল, সেই কেন্দ্রশক্তি শোষণরূপে অধিকভাবে প্রসারিত হতে লাগল। প্রজাদের সামনে আত্মরক্ষার সমস্যা এসে উপনীত হল এবং তাদের জীবনও ভীষণ বিপদাপন্ন হয়ে পড়ল। জন-সাধারণ বুঝতে পারল যে কেন্দ্রবাদের সৃষ্টি করে তারা কত ভুল করেছে। কেবল ব্যবস্থা এবং শাসনের জন্য কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়, কিন্তু তা' আর্থিকক্ষেত্রে প্রসার লাভ করার ফলে মনুষ্যজীবনের উপর ভারস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল। কারণ মানুষের আবশ্যকতা পূর্তির অধিকার সে নিজ হস্তে গ্রহণ করে।

গণতন্ত্রের অভ্যুদয়

রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক জীবনের উপর আধিপত্য বিস্তার করায় শাসকবর্গ প্রজাদের সম্পূর্ণভাবে পদদলিত করার স্বর্ণ সুযোগ লাভে সমর্থ হয়েছিল। অন্যদিকে ক্রীতদাস-প্রথা অধিকতর শক্তিশালী হওয়ায় জনসাধারণের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। মানুষের মৌলিক স্বাধীন সত্তাও লোপ পায়। পরিণামস্বরূপ প্রজারা কিরূপে সেই কেন্দ্র-শক্তির বিলীন সম্ভব সে সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগল। অর্থাৎ যে শক্তিকে প্রজারা নিজেদের মধ্যে একত্রিত করে এক কেন্দ্রীয় ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করেছিল, সেই সত্তাকে আবার নিজেদের হাতে ফিরিয়ে আনা স্থির করল। সুতরাং মানুষ কেন্দ্রীয় সত্তার বিকেন্দ্রীকরণের কথা ভাবতে লাগল। একেই আমরা রাজনীতির ভাষাতে গণতন্ত্রের স্থাপনা বলে থাকি। কিন্তু জনসাধারণ কেন্দ্রকে যে অধিকার দিয়েছিল, রাজন্যবর্গ বহুপুরুষ ধরে সেই অধিকার উপভোগ করে চলেছিলেন। ক্ষমতার এই উপভোগক্রিয়া বর্জন করা তাঁদের নিকট স্বাভাবিক ও সহজ ছিল না। কারণ কেন্দ্রীয় শক্তিকেও প্রকৃতির মূল সিদ্ধান্ত অনুসারে নিজেকে স্বরূপে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। অতএব কেন্দ্রীয় শক্তি আত্মরক্ষার জন্য শত শত বৎসরের সঞ্চিত সাধন এবং শক্তিকে গণতন্ত্রের বিনাশের জন্য প্রয়োগ করে। ফলে রাজা ও প্রজার মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং এই সংঘর্ষ রাজনৈতিক বিপ্লবের রূপ ধারণ করে। এই বিপ্লব ফ্রান্সের রাজনৈতিক বিপ্লব থেকে সুরু হয় এবং সমস্ত ইউরোপময় ছড়িয়ে পড়ে। এই বিপ্লবের সামনে রাজশক্তি টিকে থাকতে পারে নি। জনগণের বিপ্লব একরকম সফল হয় এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্রের উচ্ছল তরঙ্গ কেন্দ্রীয় রাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে।

শিল্প-বিপ্লব ও তার পরিণাম

রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করার পর গণতন্ত্রের ঢেউএর আর্থিক ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করা স্বাভাবিক। কারণ পৃথিবীর কোন বস্তু একই স্থানে অনড়

হয়ে থাকতে পারে না। প্রকৃতির নিয়মানুসারে অপর কোন শক্তির নিকট হতে বাধা না পাওয়া পর্যন্ত তাকে প্রগতি করতেই হবে। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই হল। তবে সেই তরঙ্গ আর্থিক ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করতে পারে নি। দ্বিতীয় এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার ফলে এই আন্দোলনের স্বাভাবিক প্রগতি অবরুদ্ধ হয়ে যায়। যে সময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শাসনশক্তিকে বিকেন্দ্রীত করার আন্দোলন চলেছিল, ঠিক সেই সময় জেম্‌স্ ওয়াট্ বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার করেন। বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কারের ফলে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার পূজারীরা নিজ অবস্থাকে সংগঠিত করার এক বিরাট সুযোগ পেল। প্রথম তারা কারিগরদেরকে নিজেদের আড়তে দাসরূপে নিযুক্ত করে সমাজের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করত। এখন আর তারা কারিগরদের মুখাপেক্ষী হয়ে রইল না। বড় বড় যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদন হতে লাগল। উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হল। শ্রমিকবর্গ বেকার হল এবং তাদের অবস্থা চরমে উঠল। একদিকে যখন রাজনৈতিক বিপ্লব দ্বারা কেন্দ্রীয় শাসনকে নষ্ট করা হচ্ছিল ঠিক সেই সময়েই অন্যদিকে শিল্প-বিপ্লব দ্বারা উৎপাদনের পদ্ধতিকে কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছিল। কেন্দ্রীকরণের ওই প্রক্রিয়া এমন প্রবল এবং লোভনীয় ছিল যে, সমগ্র সমাজ এর লোভ ও লিপ্সায় আবদ্ধ হয়ে পড়ল।

কারিগরও আর উৎপাদন-যন্ত্রের মালিক থাকল না। তাদের আর নিজ নিজ যন্ত্র-সহযোগে উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালনার স্বাতন্ত্র্য রইল না। বিশাল কারখানাতে এসে তারা এখন খালি হাতে বিরাট বাষ্পযন্ত্রের সাহায্যে কাজ করতে বাধ্য হল। বাষ্পীয় যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে কারিগররা অর্থাৎ উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত শ্রমিকবর্গ আর্থিক দৃষ্টিতে অসহায় হয়ে পড়ল। পরিণামস্বরূপ সমাজ এক বিরাট বিপ্লব সংগঠন করে প্রগতি করার যে কল্পনা করেছিল, তা নিষ্ফল হল। মূল বিপ্লবের সমস্ত গতি-প্রকৃতি বদলে গেল এবং সমাজের সমস্ত সমস্যা পূর্ববৎ থেকে গেল।

পুঁজিপতিরা স্বত্বাধিকারী হল কি করে

জীবন ধারণোপযোগী সাধনপ্রাপ্তির চেষ্টা মানুষের মূলবৃত্তি। এই চেষ্টার পরিণামেই বস্তুর উৎপত্তি হয়ে থাকে। অতএব এ কথা স্বাভাবিক যে, সমাজের কাঠামো হুবহু উৎপাদনের পদ্ধতি অনুসারে হবে। বাষ্পীয় যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে উৎপাদনক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়। বিকেন্দ্রীত উৎপাদন-পদ্ধতি বদলে গিয়ে কেন্দ্রীত হয়ে পড়ে। উৎপাদন-পদ্ধতি কেন্দ্রীত হয়ে যাওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় রাজতন্ত্রের ধ্বংস হওয়া সত্ত্বেও শাসন-পদ্ধতি কেন্দ্রীত থেকে যায়। অন্য সব দিকেও সমাজের সংগঠন কেন্দ্রীয় পদ্ধতিতে হতে থাকে। শোষণ-যন্ত্র কেন্দ্রীত হওয়ায় তার সঞ্চালনের জন্য কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রয়োজন হতে লাগল; কারণ, সমাজের সকল ব্যক্তি এসে তা চালনা করতে পারে না। অতএব গণতন্ত্র প্রতিনিধি-ব্যবস্থার রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ জনসাধারণের মতানুসারে কোন ব্যক্তিকে প্রতিনিধি করে তার দ্বারা শাসনসূত্রের সঞ্চালন হতে লাগল। এর নাম রাখা হয় প্রজাতন্ত্র।

যন্ত্রের উপর অধিকার স্থাপনা করে সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থার উপরও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার পর শাসকবর্গের পক্ষে উৎপাদিত সম্পদ শক্তির আধারে জনমত ক্রয় করে জনপ্রতিনিধি হয়ে যাওয়া সহজ হয়ে পড়ল। এইরূপে তারা শাসনযন্ত্রের উপরও একাধিপত্য স্থাপনা করে ফেলে। উৎপাদন-যন্ত্র যাদের হাতে ছিল শাসন-যন্ত্রও তাদের হাতে এসে গেল। অর্থাৎ শাসন-যন্ত্র থেকে উৎপাদন-যন্ত্র, উৎপাদন-যন্ত্র থেকে শাসন-যন্ত্র— এইরূপে অধিকারের হাতফের হতে থাকল। কিন্তু জনসাধারণ যেমনকার তেমনই পড়ে রইল বরং উৎপাদন এবং শাসন দুই অতীব কেন্দ্রীত হওয়ার জন্য পুঁজিপতিরাই স্বত্বাধিকারী হল এবং প্রজারা এই পুঁজিবাদী সমাজে সামন্ত-ব্যবস্থার অপেক্ষা অধিক শোষিত ও লাঞ্ছিত হতে লাগল।

দাস-প্রথার পরিসমাপ্তি এবং শ্রমিক-প্রথার প্রারম্ভ

এ কথা ঠিক যে, সামন্তবাদী সমাজে শ্রমিকরা ক্রীতদাস ছিল। কোন প্রকার স্বাতন্ত্র্য তাদের ছিল না। তারা মালিকের আদেশানুযায়ী উঠাবসা করত। পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতিরা স্বাতন্ত্র্যের শ্রুতিমধুর বুলি আওড়ে দাসপ্রথার বিলুপ্তিসাধন করে শ্রমিকদের স্বাধীন করে দিল। কারণ, তারা দেখল যে দাস-প্রথা না উঠালে তাদের স্বার্থসিদ্ধির বিঘ্ন ঘটবে। বাষ্পীয় যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদন হওয়ার ফলে আগেকার মত আর অধিক সংখ্যক শ্রমিকদের আবশ্যকতা রইল না। সুতরাং ক্রীতদাসদের পরিবার প্রতিপালন করাতে ক্ষতি ছিল। তারা দেখল যে, ক্রীতদাসদের স্বাধীন করে দিয়ে আবশ্যকতা অনুযায়ী তাদের মজুররূপে কাজে লাগালে পড়তা সমান পড়বে। এইভাবে দাস-শ্রমিকদের অপেক্ষা স্বাধীন-মজুরদের কাছ থেকে কাজ নেওয়ায় তাদের অধিক পরিমাণে লাভ হতে লাগল। ফলে বেকার শ্রমিক-পরিবার ক্ষুধার জালায় মরতে লাগল।

কলকারখানার দ্বারা উৎপাদন হওয়াতে বেকারী ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। পুঁজিপতিদের পক্ষে ইচ্ছানুসারে শোষণ করা সহজ হয়ে পড়ল। কারণ, কোন শ্রমিক এই অত্যাচারের বিরোধিতা করলে তার চাকরি যেত এবং তার বদলে অনেক বেকার ও বুভুক্ষু লোক যে কোন শর্তে কাজ করতে রাজী হয়ে যেত।

স্বাবলম্বী উৎপাদনের বিলোপ : গণতন্ত্রের বিনাশ

কেবল মজুররাই নয়, কৃষক এবং অন্য লোকেরাও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফলে পূর্বাপেক্ষা অধিক অসুবিধায় পড়ে। সামন্তবাদী সমাজে বহুসংখ্যক সামন্তের অস্তিত্ব ছিল। সুতরাং সাধারণ প্রজারা তাদের অন্তর্বিরোধের ফলে লাভবান হত। এছাড়া তাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতি এবং রুচির স্বভাবতঃ পার্থক্য থাকত। এর দ্বারাও কখন কখন প্রজাদের অবস্থার ইতর-বিশেষ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সামন্ত আর প্রজাদের মধ্যে কিছু কিছু

ব্যক্তিগত সম্বন্ধও ছিল। এতে প্রজাদের সামান্য সুবিধাও হত। উৎপাদন-যন্ত্র উৎপাদকদের হাতে থাকার জন্য কারিগর বা কুঠীর বাহিরেও অল্প অল্প নিজেদের প্রয়োজনপোযোগী পণ্য উৎপাদন করতে পারত। কুঠীর ভিতর কেন্দ্রীত থাকলেও উৎপাদন অনেকাংশে বিকেন্দ্রীত ছিল। জীবনে আবশ্যকীয় বস্তুর জন্য প্রজাকে সম্পূর্ণভাবে সামন্তদের উপর নির্ভর করে থাকতে হত না। সামন্ত-প্রথাতে শাসনের আকার-প্রকার কেন্দ্রীত থাকলেও সামন্তদের সংখ্যাধিক্যের জন্য ঐসব কেন্দ্রও বিকেন্দ্রীতভাবে চলত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে কেন্দ্রীকরণ বাড়তেই থাকে। ধীরে ধীরে ধনীদের ভিতর সংগঠন তৈরী হতে লাগল। ছোট ছোট কোম্পানি গিয়ে বড় বড় কোম্পানিতে যুক্ত হতে লাগল। প্রজা ও পুঁজিপতিদের ভিতর ভেদ বাড়তে লাগল। উৎপাদনের সাধন প্রজাদের হাত থেকে বেরিয়ে গিয়ে কেন্দ্রীত হয়ে যেতে লাগল এবং প্রজাদের সম্পূর্ণভাবে আর্থিক নিঃশস্ত্রীকরণ হয়ে গেল। এইভাবে প্রজাগণ স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাবলম্বন বিসর্জন দিয়ে নিজেদের আবশ্যকতা পূর্তির জন্য সম্পূর্ণরূপে এই সব ধনীদের কবলে এসে পড়ে ও তারপর তাদের বাধ্য হয়ে ধনীদের প্রত্যেকটি শর্ত মেনে নিতে হয়। কিন্তু প্রচার করা হতে লাগল যে, সবকিছু প্রজাদের ইচ্ছানুসারে প্রজাদের প্রতিনিধিদের দ্বারাই করা হচ্ছে। এইরূপে অসহায় লোকেদের প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র আখ্যা দেওয়া গণতন্ত্রের উপহাস ছাড়া আর কি হতে পারে? কারণ প্রয়োজনের গরজে দমিত জনসাধারণ কি করে স্বাধীন মত জাহির করবে?

এইভাবে শিল্প-বিপ্লব পুঁজিবাদের জন্ম দেয় এবং পুঁজিবাদ গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করে। গণতন্ত্রের পরম পবিত্র কল্পনা কেবল বিধানসম্বন্ধীয় পুস্তকের পৃষ্ঠাতেই লিপিবদ্ধ থেকে যায়। এতে প্রাণসঞ্চার হতে পারল না। দরিদ্র প্রজাদের দশা হল মোকদ্দমায় জয়লাভ করার পরও জমির দখল না-পাওয়া কৃষকের মত।

প্রচুর উৎপাদনের পরিণাম

পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে অব্যবস্থিতভাবে উৎপাদন হওয়ার কারণে ভোগ্য বস্তুর অপব্যবহার হতে লাগল। নিজের খেয়ালখুশিমত উৎপাদন করার সময় কেউ ভাবে না যে, সমাজে কোন্ জিনিস কতটা ও কিরূপ প্রয়োজন। প্রত্যেক উৎপাদক তাৎকালিক স্থিতি অনুসারে অধিকতম লাভদায়ক পণ্য উৎপাদন করার জন্য সমস্ত কাঁচামাল শেষ করে ফেলে। বেকারী বাড়ার জন্য জনসাধারণের ক্রয়শক্তি হ্রাস পায় এবং তার ফলে উপভোক্তার সংখ্যা কম হতে থাকে। কোন্ পণ্যের কতটা চাহিদা, সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা না থাকায় কাঁচামাল উৎপাদনকারী কৃষকদের পক্ষে কাঁচামাল উৎপাদনের আনুপাতিক হার বোঝা বা অনুমান করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ল। এক বৎসর বাজারে কোন বস্তুর চাহিদা দেখে পরের বৎসর কৃষক হয়ত সেই পণ্য বেশী করে উৎপন্ন করল। কিন্তু দেখা গেল যে, সে বৎসর বাজারে সে বস্তুর চাহিদাই নেই। তখন তাদের অবস্থা অতীব শোচনীয় হয়ে পড়ল। বাজারের অবস্থা দেখে কৃষকরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। জীবনের প্রতি তখন তাদের আর আকর্ষণ থাকল না এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রতিও তারা উদাসীন হয়ে পড়ল। এইভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে বিশ্বের অবস্থা এমন হয়ে পড়েছিল যে, একদিকে অত্যধিক উৎপাদনের জন্য লোকে উৎপন্ন সামগ্রী বিনষ্ট করতে থাকে এবং অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নরনারী ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করে মরতে থাকে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, মানুষ যে হিংসা, শোষণ, দাসত্ব ও অনশনের হাত থেকে ত্রাণ পাবার জন্য সমস্ত প্রথা ধ্বংস করেছিল, পুঁজি-বাদী সমাজে তার হ্রাস হবার পরিবর্তে আরও বৃদ্ধি পেল। মানুষের জীবন অধিকতর বিপন্ন হল। সুতরাং সমাজকে নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নূতন প্রক্রিয়ার কথা চিন্তা করার প্রয়োজন হল। এতদুদ্দেশ্যে সমাজকে একাধিক প্রয়োগ করতে হয়। এর ভিতর মুখ্য হচ্ছে একাধিনায়ক প্রথা ও ফ্যাসিবাদ।

(২)

কার্ল মার্ক্স

একশত বৎসর পূর্বের কথা। জনসাধারণ পুঁজিবাদের কারণে ত্রস্ত ও ব্যাকুল। তাই তাদের সমষ্টিগত অধীরতার কারণে কার্ল মার্ক্সের জন্ম হয়। কার্ল মার্ক্স অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও বিদ্বান ছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে সমগ্র অবস্থার অধ্যয়ন করলেন।

মার্ক্সীয় দর্শন

সর্বপ্রথম শাসনযন্ত্রকে বিকেন্দ্রীত করার জন্য সংঘটিত বিগত বিপ্লবের অসফলতার কারণ অধ্যয়ন করতে গিয়ে মার্ক্স দেখলেন যে, জনসাধারণের সম্পত্তি পুঁজিপতিদের করতলগত হবার জন্য তারা জনসাধারণকে নির্মম ভাবে পিষ্ট করে আসছে। তিনি আরও দেখলেন যে, যতদিন পর্যন্ত জীবনধারণের পক্ষে আবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রী পুঁজিপতিদের হাতে থাকবে, ততদিন জনসাধারণকে তাদের অধীন থাকতে হবে। অতএব তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, যতদিন পর্যন্ত ভোগ্য বস্তুর উপর সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিন সমাজ তার যথাযোগ্য ব্যবহার করতে সক্ষম হবে না, এবং ততদিন শাসনযন্ত্রের উপরও তাদের অধিকার আসার সম্ভাবনা নেই। ভোগ্য বস্তুর উপর অধিকার তখনই আনা সম্ভব যখন সেইসব বস্তুর উৎপাদন-ব্যবস্থা ও উৎপাদন-যন্ত্রের উপর জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। কারণ ইতিহাস বলে যে, শাসনযন্ত্র অথবা আর্থিক শক্তি দু'য়ের মধ্যে যে কোন একটির উপর কোন শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে অন্যটির উপরও তা পরিব্যাপ্ত হয়। এইজন্য শাসন-যন্ত্র ও উৎপাদন-যন্ত্র উভয়ের উপরই জনসাধারণের অধিকার স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। ইতিহাসের ভিত্তিতে এইরূপ চিন্তা করাই স্বাভাবিক। সুতরাং মার্ক্সের কথা লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করে ও জনসাধারণ আবার এক

বিপ্লব করে। প্রথম বিপ্লব হয়েছিল শাসন-যন্ত্রকে অধিকার করার জন্য; আর দ্বিতীয় বিপ্লব হল উৎপাদন-যন্ত্রকে দখল করার জন্য। কোথাও এই বিপ্লব পূর্ণতঃ সফল হয়, কোথাও আংশিকভাবে সফল হয়, আবার কোথাও বা একবারে বিফল হয়। কিন্তু আদর্শ ও মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে স্বীকার করাও হবে যে, পৃথিবীতে স্বাধীনতা ও শান্তি স্থাপনের জন্য মার্ক্সএর পন্থাই অনুসরণ করতে হবে—একথা বিশ্বের বহু লোকের মনেই এল।

ফ্যাসিবাদের জন্ম

অন্যদিকে কিছু লোক দেখলেন যে, সমস্ত গোলযোগের মূল পুঁজিপতির স্বাচ্ছন্দ্য ও অবাধ উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যে লুক্কায়িত রয়েছে। তাঁরা আরও ভাবলেন যে প্রতিনিধিমূলক শাসন-পদ্ধতির ফলে জনসাধারণের ভিতর দায়িত্বহীনতার মনোভাব প্রবল হয়ে পড়েছে এবং সমগ্র সমাজে ও পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ জনসাধারণ নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের ভরসায় সকল দায়মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকে। এই নিশ্চিন্ততার ফলে জনসাধারণের বিচারশক্তি পঙ্গু হয়ে যায় ও ক্রমশঃ তারা নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে। এইরূপে সমাজে দুইটি শ্রেণী থেকে যায়। প্রথম হচ্ছে স্বচ্ছন্দ পুঁজিপতিবর্গ ও দ্বিতীয় হচ্ছে প্রতিনিধির উপর নির্ভরশীল দায়িত্বহীন নিশ্চেষ্ট জনসাধারণ। নিজেদের অচেতন অবস্থার জন্য এরা আবার চতুর পুঁজিপতিদের কাছে বিকিয়ে রয়েছে। সুতরাং সমাজ-ব্যবস্থাকে সচেতন, কুশল এবং পরিস্থিতির অনুকূল করে তোলার উপায় অন্বেষণ করার প্রয়োজন দেখা দিল। জনসাধারণ নিশ্চেষ্ট হয়ে যাওয়াতে গণতন্ত্রের কোন মূল্য থাকে না। সেইজন্য এদের গণতন্ত্রের উপর কোন আস্থা ছিল না। তাঁদের মতে একটি শক্তিশালী সুযোগ্য ও জাগ্রত দলের দ্বারা জনসাধারণ ও পুঁজিপতি দুইয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ রেখে জনসাধারণকে, সক্রিয় এবং সুব্যবস্থিত করা

প্রয়োজন হয়ে উঠল। কিন্তু কাজ তো সহজ নয়। আগে থেকেই পুঁজিপতিদের হাতে শক্তি ও সম্পত্তি দুইই জমা ছিল। কেউ এসে তাঁদের উপর প্রভুত্ব করুক, এ তাঁরা কি করে বরদাস্ত করতে পারেন? অন্যদিকে প্রজাদের মাথায় এই ভালভাবে প্রবেশ করে রয়েছে যে তাদেরই মতানুসারে দেশের সমস্ত ব্যবস্থা চলছে। সেইজন্য তাদের অমতে অন্য কেউ এসে তাদের উপর শাসন করুক এ কথা মেনে নিতে তারাও প্রস্তুত ছিল না। আর এ কথাও ঠিক যে, এইরূপ কোন শক্তিশালী দলের শাসনের ফলে জনসাধারণ এবং পুঁজিপতি উভয়কেই পরপদানত হতে হত (যদিও তাদের মধ্যে একের স্বাধীন স্থিতি বাস্তবিক, আর অন্যের স্বাধীনতা কাল্পনিক)। অতএব যাঁরা এইভাবে সমাজ সঞ্চালনের কথা চিন্তা করেছিলেন, একটি শক্তিশালী এবং দৃঢ় সঙ্কল্পদল বানিয়ে সমস্ত সমাজের উপর বল-প্রয়োগে নিজ অধিকার স্থাপন করা তাঁদের কাছে প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল। এ না হলে সমাজ পরিচালনা এবং উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা যথাযথভাবে চলতে পারে না।

এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পুঁজিবাদীসঙ্কট থেকে রেহাই পাবার জন্য সমাজে দুটি বিচারধারা দেখা দিল। একদিকে রাশিয়ার (মার্ক্সের) সর্বাধিনায়কবাদী পরিকল্পনা এবং অপরদিকে ইতালীর ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা।

নিরাশজনক স্থিতি

এই দুটি প্রয়োগ প্রায় একই সময়ে আরম্ভ হয়। কিন্তু কিছুদিন পর থেকেই দেখা যেতে লাগল যে হিংসা এবং দাসত্ব থেকে রক্ষা পেয়ে সুখ আর শান্তিতে বেঁচে থাকা এবং গণতন্ত্রকে কায়েম রাখা, সমাজের এই যে প্রথম উদ্দেশ্য তা এই পন্থায় সিদ্ধ হচ্ছে না। কেন এমন হল? এ বিষয়ে গভীর ভাবে বিচার করা দরকার। ফ্যাসিবাদী নেতারা প্রধানতঃ নিজেদের

দেশের কল্যাণকামী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি এমন ছিল যে তার ফলে তাঁরা একটি নিশ্চিত জালে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। একটি ছোট শক্তিশালী ও বিপ্লবী দলরূপে তাঁরা তাঁদের জন-জীবনের সূত্রপাত করেন। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিকোণ গণতন্ত্র-বিরোধী হওয়ায় তাঁদের সমস্ত সংগঠিত শক্তি পুঁজিবাদের হাতের অস্ত্রস্বরূপ হয়ে পড়ল। পুঁজিবাদ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এবং গণতন্ত্র বনাম একনায়কত্বের সংঘর্ষের ভয়ে ভীত থাকত। পুঁজিবাদের লক্ষ্য ছিল নিজেকে সুদৃঢ় এবং সংগঠিত করে সমাজের বুকের উপর চেপে বসা। তারা ফ্যাসিবাদী নেতৃত্ব এবং তার সংগঠন-পদ্ধতির ভিতর নিজেদের উদ্ধারের সম্ভাবনা দেখে ফ্যাসিবাদকে সাহায্য করে অগ্রসর হবার কার্যক্রম গ্রহণ করে। ফ্যাসিবাদী নেতারাও পুঁজিবাদীদের সাহায্য লাভ করে তাদের প্রকৃত হিতৈষী মনে করতে লাগল। এইরূপে পুঁজিবাদী সাধন এবং ফ্যাসিবাদী ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন একত্র হয়ে এরূপ ভয়ংকর এবং শক্তিশালী দল সৃষ্টি হল যে, রাষ্ট্রের কোন দল বা অঞ্চল তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অপারগ হল। বস্তুতঃ এই দল ফ্যাসিবাদের নামে দেশের সমস্ত বিরোধী শক্তিকে পদানত করে এক স্বৈরতন্ত্রী শাসন-ব্যবস্থা স্থাপনা করে। জনসাধারণ তার বজ্র-মুষ্টির পেষণে কোথায় তলিয়ে গেল!

একনায়কত্বের আদর্শ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এবং গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতেই সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এই লক্ষ্যে উপস্থিত হবার সাধন এবং পদ্ধতি এইরূপ ছিল যে পূর্বোক্ত আদর্শ অনুসারে সমাজ রচনার প্রচেষ্টার পরিণাম-স্বরূপ স্বৈরতন্ত্র দৃঢ়মূল হল। উৎপাদন-যন্ত্র কেন্দ্রীত হবার ফলে শ্রমিকদের নামে এক সংগঠিত দল তার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে ও শ্রমিকদের পক্ষ থেকে তার পরিচালনা করতে থাকে। সেই দলও ক্রমশঃ ফ্যাসিবাদীদের মত অন্য সব দলকে পদদলিত করে স্বৈরতন্ত্রী হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ একে হিংসার ভিত্তিতে জোর করে কিছু চাপিয়ে দেবার স্বাভাবিক পরিণাম আখ্যা দিতে হবে।

অতএব হিংসার প্রগতিকে সীমাবদ্ধ করার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রেও ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের মত একাধিনায়কত্বের আধিপত্য। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, ফ্যাসিবাদী স্বৈরতন্ত্র নগ্নরূপে এবং সমষ্টিবাদীর স্বৈরতন্ত্র গণতন্ত্রের শব্দজালে আবরিত হয়ে প্রকট হয়।

ফ্যাসিবাদী শাসনে জনসাধারণ অন্ততঃ জানে যে তারা দলিত ও পর-পদানত। তাই জনসাধারণ সেখানে কোন দিন হয়ত পীড়নানুভূতির কারণে স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটাতে পারে। কিন্তু সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রে জনসাধারণ আত্মপ্রতারণার পাষাণভারে চাপা থাকে। তারা এই অলীক আশা পোষণ করে দিন গোণে কোন দিন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে শাসনশক্তি আপনা আপনি শুকিয়ে বিলুপ্ত হবে ও তখন তারা স্বাধীন হবে। "আস্থা রাখো, মুক্তি একদিন পাবেই" এই জাতীয় এক ভ্রম তাদের সর্বদা নিশ্চেষ্ট করে রাখে এবং তাই সহজে তাদের মন স্বৈরতন্ত্রকে বিলুপ্ত করার দিকে যায় না। সমষ্টিবাদের আদর্শ এত মহান্ হওয়া সত্ত্বেও কি করে জন-সাধারণ এর পাষাণ-ভারের নীচে চাপা পড়ে গেছে বস্তুতঃ এ একটা চিন্তার বিষয়। অতএব এই সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার।

সমষ্টিবাদী সমস্যা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিনাশ

সমষ্টিবাদীরা দেখল যে সমাজের যাবতীয় হিংসা ও সংঘর্ষের মূল হচ্ছে মানুষের হৃদয়স্থিত স্বার্থবুদ্ধির আধিক্য। বস্তুতঃ হিংসাই সমাজকে দূষিত করার একমাত্র কারণ এবং মানবসমাজের প্রারম্ভ থেকেই দেখা যাচ্ছে যে স্বার্থ ও সংঘর্ষ হিংসার জন্মদাতা। অতএব সমষ্টিবাদীরা হিংসাকে নির্মূল করার বিষয়ে চিন্তা করতে লাগল। তারপর তাদের চোখে পড়ল যে সম্পত্তি থেকেই স্বার্থের সৃষ্টি হয়। কারণ সমস্ত স্বার্থ সম্পত্তির মধ্যেই নিহিত থাকে। অতএব তাঁরা ভাবলেন যে, মানুষকেই সম্পত্তিবিহীন

করতে পারলে স্বার্থবুদ্ধির স্থান থাকবে না। এইজন্য সমষ্টিবাদী ব্যবস্থাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোন স্থান দেওয়া হয় না।

শ্রেণীবিহীন সমাজের আবশ্যকতা

হিংসার অপর একটি রূপ শোষণ। তাঁরা দেখলেন যে সমাজ কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত এবং যতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে ততদিন শোষণও চলতে থাকবে। যে পর্যন্ত সমাজ পুঁজিপতি, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত থাকবে, ততদিন একের শোষণে অপরের স্বার্থ পুষ্ট হতে থাকবে। স্থতরাং তাঁদের মতে সমাজ থেকে সর্ববিধ শ্রেণীভেদ বিলুপ্ত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। এইভাবে দেখা যাচ্ছে সমষ্টিবাদী আদর্শ অনুসারে পৃথিবীতে শ্রেণীবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

শাসনহীন সমাজের আবশ্যকতা

ইতিহাস থেকে তাঁরা এই জ্ঞান পেয়েছিলেন যে মানুষের ভিতর পারস্পরিক হিংসাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য শাসনব্যবস্থার আবশ্যকতা হয়েছিল। অর্থাৎ ছোট ছোট ব্যক্তিগত হিংসাকে দমন করার জন্য এক বৃহৎ হিংসাশক্তিরূপী শাসনসত্তার প্রয়োজন হয়েছিল। শাসনের অর্থ হচ্ছে জবরদস্তী বা স্বাতন্ত্র্যহীনতা। কারণ মানুষের উপর যতটুকু শাসন থাকবে, তাকে ততখানি শাসনের অধীনতা স্বীকার করতে হবে এবং তার স্বাতন্ত্র্য ততখানি খর্ব হবে। অতএব সমষ্টিবাদী সমাজের নীতি অনুসারে পৃথিবীকে হিংসা এবং শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য সমাজকে শাসনহীন করা আবশ্যক।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সমষ্টিবাদী কল্পনানুসারে পৃথিবীকে হিংসা-রহিত, শোষণহীন এবং স্বাধীন রাখতে হলে সমাজকে শাসনহীন ও শ্রেণীহীন ব্যবস্থার আধারে সংগঠিত করা প্রয়োজন। তাঁদের কল্পন নুসারে

সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রেণীবিষমতা অথবা শাসনের স্থান থাকা উচিত নয়। প্রকৃত এইরূপ সমাজ সৃষ্ট হলে জনসাধারণের চিরকালের চেষ্টা সফল হবে। কার্ল মার্ক্স ভাবী সমাজের এইরূপ কল্পনা করে মানবসমাজের প্রভূত উপকার করেছেন। তিনি কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতার বিকট জ্বালা থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করার জন্য এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেন এবং তাঁর চিন্তাধারার একটা নির্দিষ্ট স্বরূপ ছিল ও এর ভিতর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ধারণা ছিল। এইভাবে আমরা মার্ক্সবাদী অর্থাৎ সমষ্টিবাদী লক্ষ্যের একটি স্পষ্ট চিত্র দেখতে পাচ্ছি।

সমষ্টিবাদী রীতিনীতি

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, এইরূপ আদর্শে উপনীত হবার উপায় কি? কার্ল মার্ক্স বলেছেন যে, সম্পত্তি বা উৎপাদনের সাধনের উপর জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে শ্রমিক অর্থাৎ উৎপাদকদের হাতে সমস্ত কর্তৃত্ব সমর্পণ করলে এইরূপ সমাজব্যবস্থার স্থাপনা সম্ভব। সুতরাং মার্ক্সের অনুগামীরা উৎপাদনের সাধনের উপর থেকে অপরের অধিকার দূর করে তার উপর শ্রমিকের কর্তৃত্ব স্থাপনার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন।

এ যাবৎ সমাজে পুঁজিপতি এবং কৃষক এই উভয় সম্প্রদায় সম্পত্তিবান ছিল। শ্রমিকরাই এমন একটি শ্রেণী ছিল, যারা সম্পূর্ণভাবে নিজ শ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জন করত এবং তাদের কাছে কোন প্রকার বিত্ত ছিল না। তাই মার্ক্সবাদীদের মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তিবিহীন, শাসনহীন, তথা শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপনের উপযোগী ছিল এই শ্রমিকশ্রেণী এবং তাই এই আদর্শে পৌছাবার দায়িত্বও স্বভাবতঃ এদের উপর পড়ে বলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন। সুতরাং প্রথমে সমস্ত ক্ষমতা এই শ্রমিকশ্রেণীর হাতে সমর্পণ করা প্রয়োজন এবং তাহলেই তারা দক্ষতাসহকারে শাসনহীন ও শ্রেণী-হীন সমাজ স্থাপনে সমর্থ হবে। কিন্তু ব্যাপার এত সহজ ছিল না এবং

সমগ্র দেশও যে এই কর্মসূচী গ্রহণে সম্মত হবে একথা বলা সম্ভব ছিল না। কারণ পুঁজিপতি এবং কৃষক—উভয় শ্রেণীই নিজেদের সম্পত্তির অধিকার বিসর্জন করে মজুরদের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং জোরজবরদস্তী করার প্রয়োজন অনুভূত হল এবং এর জন্য গোড়াতে শ্রমিকদের তরফ থেকে একটি জাগ্রত এবং সুসংগঠিত দল সমস্ত কিছু দখল করবে—এই অবস্থা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াল। মার্ক্সবাদীরা মনে করেন যে অন্য কেউ এই আদর্শের প্রতি অনুগত থাকতে পারে না; কারণ তারা কেউ আদর্শকে যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম নয়। সুতরাং এই দল শ্রমিকদের পক্ষ থেকে প্রথমেই সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করল। জনসাধারণের স্বাধীনতা অপহরণ করার পর তাঁরা প্রজাদের ঠিক সেইরূপই দমন করতে আরম্ভ করলেন যেরূপ পুরাকালে জনসাধারণের ধর্মরক্ষার ঠিকাদারেরা জনগণের আধ্যাত্মিক পবিত্রতা রক্ষার অছিলাতে তাদের জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলাকেও তাদের প্রতি করুণা ও আশীর্বাদ বলেই মনে করত।

দুই ধারা

এইভাবে সমাজকে পুঁজিবাদী সংকট থেকে রক্ষা করার জন্য দুই প্রকার প্রয়োগ সুরু করা হয়। প্রথমটির প্রচেষ্টা ছিল, একটি সক্রিয়, সবল ও সুযোগ্য দলের দ্বারা পুঁজিপতি ও জনসাধারণ—এই দুই শ্রেণীর উপর অধিকার স্থাপন করে সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালন দ্বারা সুখ ও শান্তি স্থাপন করা। দ্বিতীয় প্রয়োগের লক্ষ্য ছিল, শ্রমিকদের পক্ষ থেকে পুঁজিপতি ও কৃষক—এই দুই শ্রেণীকে বলপ্রয়োগে বিলুপ্ত করে দিয়ে সমস্ত ক্ষমতা শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে একটি সুযোগ্য এবং শক্তিশালী দলের হাতে সমর্পণ করা। এর দ্বারা একটি মাত্র শ্রেণীর একনায়কত্ব স্থাপিত হবে ও তার পরিণামে শোষণ এবং সংঘর্ষের অবসান হবে। কিন্তু

উভয় প্রয়োগের সাফল্যের আধারই ছিল ব্যাপক হিংসা ও একটিমাত্র দলের একনায়কত্বের উপর। এইজন্য আজ পৃথিবীতে স্বৈরতন্ত্র এত দ্রুতবেগে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। পুঁজিবাদের অবাধ শোষণে নিষ্পেষিত জনসাধারণের সামনে অন্য কোন পন্থা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। জনসাধারণ উত্তপ্ত কটাহ থেকে লাফ দিয়ে প্রজ্বলিত চুল্লীতে পড়তে উদ্যত।

পুঁজিবাদী এবং সমষ্টিবাদী বিধান

উৎপাদন-পদ্ধতি ও তৎসম্পর্কীয় ব্যবস্থা এই একনায়কত্বকে সম্প্রসারিত হতে সহায়তা করেছে। সামাজিক রীতিনীতি সর্বদাই উৎপাদনের রীতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। সমষ্টিবাদী সমাজের উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে পুঁজিবাদী-পদ্ধতির কোন পার্থক্য ছিল না। উভয়েই কেন্দ্রবাদী ছিল। সমষ্টিবাদীরা কেবল ঐ সকল কেন্দ্রীয় যন্ত্রের সঞ্চালন-ভার শ্রমিকদের মুখপাত্ররূপী একটি দলের হাতে সমর্পণ করেছিল। পুঁজিবাদী সমাজে জনপ্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত শাসনযন্ত্রকে পুঁজিপতিরা প্রতিনিধিত্বের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে নিজেদের অধীনে রেখেছিল। এইরূপে শাসন এবং উৎপাদন দুই-এর উপরেই পুঁজিপতিদের কর্তৃত্ব ছিল। সমষ্টিবাদী বিধানে মাত্র এইটুকুই প্রভেদ হল যে দুইটি যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ পুঁজিপতিদের হাত থেকে বেরিয়ে একটি দলের হাতে এসে পড়ল (তবে এই দল শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করার দাবী করে ও বলে যে কর্তৃত্ব তাদেরই হাতে সমর্পণ করবে)।

সম্পত্তির মোহ অপেক্ষা ক্ষমতার মোহ অধিকতর শক্তিশালী

সমষ্টিবাদীরা বলেন যে, একবার কারও হাতে সম্পত্তি একত্রিত হলে সে সেই সম্পত্তিকে তো ছাড়তে চায়ই না, বরং সেই সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সে সচেষ্ট হয় এবং এ কার্য শুধু অপরের শোষণ দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু মানুষের স্বার্থ কেবল সম্পত্তির উপর অধিকার স্থাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সমষ্টিবাদীরা ভুলে গেছেন যে অধিকারের মোহ সম্পত্তির মোহ অপেক্ষা

অধিক শক্তিশালী। যে ব্যক্তি বা দল একবার শাসনদণ্ড হাতে পাবে, তারা সে ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে না দিয়ে তাকে নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করে রাখবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকবে এবং কেবল অপরকে দলন করেই এ উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। ফলে যে দল গোড়াতে শ্রমিক রাজ্য কায়েম করার উদ্দেশ্য নিয়ে কর্মক্ষেত্রে নামে, তারা সংগ্রামে জয়ী হবার পর শ্রমিকদের তরফ থেকে শাসনভার গ্রহণ করে এবং অতঃপর নিজেদের শক্তিশালী করে "শ্রমিক রাজত্ব" নাম নিয়ে রাজত্ব করতে সুরু করে। এইজন্য যে দল জনতাকে স্বাতন্ত্র্য দেবার জন্য শাসনারূঢ় হয়েছিল, তাকে আজ কোন না কোন প্রকারে নিজের অধিকার বজায় রাখার জন্য ফিকির খুঁজতে হচ্ছে।

কেন্দ্রীকরণের পরিণাম

বহুসংখ্যক পুঁজিপতিকে খতম করে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করার সময় সমষ্টিবাদীরা এ কথা খেয়াল করেননি যে, তাঁরা মনুষ্য-জীবনধারণের উপযোগী সাধনসামগ্রী প্রাপ্তির উপায় পূর্বাপেক্ষা অধিক কেন্দ্রীত করে দিচ্ছিলেন। ফলে পূর্বে যেখানে নিজ ভোগ্যবস্তু বহু কেন্দ্রের ভিতর যে কোন একটি থেকে নির্বাচন করে নেবার স্বাতন্ত্র্য জনসাধারণের ছিল, সেখানে তাদের এক ও অদ্বিতীয় সঞ্চালক ছাড়া অন্য কারও কাছে যাওয়ার উপায়ই নেই। সঞ্চালক যখন দেখল যে তাকে ছাড়া জনসাধারণের জীবন-যাত্রা অব্যাহত রাখার অন্য কোন পন্থা নেই তখন সে ভালভাবে তাদের বুকের উপর চেপে তাদের একাধিনায়ক হয়ে পড়ল। পরিণামস্বরূপ সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রসমূহেও জনসাধারণ ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের মতই স্বৈরতন্ত্রী একাধিনায়কের বজ্রমুষ্টি ও রক্তচক্ষুর নিচে মুহ্যমান রয়েছে।

(৩)

গণতন্ত্র

মানব-ইতিহাসের প্রারম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলী দেখলে বোঝা যায় যে, জনসাধারণ একবার কোন কেন্দ্রের জালে আবদ্ধ হবার পর সেই বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার যতই চেষ্টা করুক না কেন, তারা ক্রমশঃ অধিকমাত্রায় তাতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সুতরাং কোন্ বিষয় পুনঃ পুনঃ গণতন্ত্র স্থাপনার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। সফল গণবিপ্লবের জন্য শাসনসত্তা বিকেন্দ্রীত হয়ে প্রজাদের হাতে আসা আবশ্যক। প্রজারা এই কার্যসাধনে প্রায় সফল হয়েছিল। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের ফলে ঠিক ঐ সময় উৎপাদনের সাধন কেন্দ্রীত হয়ে গেল এবং পুঁজিপতিরা তাকে করায়ত্ত করে ফেলেন। এর পরিণামে উৎপাদনের-যন্ত্র করায়ত্ত হবার কারণে শাসনযন্ত্রও পুঁজিপতিদের হাতে এসে পড়ল এবং তারা নবজাত গণতন্ত্রকে অঙ্কুরে নষ্ট করে দিল। অর্থাৎ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীত হতে পারল না; কেবল তার পরিচালকের পরিবর্তন হল। এইরূপে রাজ্যাধিকার সামন্তবর্গের হাত থেকে পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে চলে আসে। কার্লমার্ক্স এই অবস্থা দেখে উৎপাদন-যন্ত্রের উপর সমাজের অধিকার স্থাপনের কথা বলেন। মার্ক্সএর এই পরামর্শ অনুসারে লোকে প্রায় একশত বৎসর যাবৎ চেষ্টা করে ও কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এর পর গান্ধীজীর আবির্ভাব হয়। তিনি দেখলেন যে, মার্ক্স-কথিত পদ্ধতিতে সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। কারণ যতদিন উৎপাদন ও শাসনযন্ত্র কেন্দ্রীত থাকবে, ততদিন জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা আসতেই পারে না।

একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে কেন্দ্রীয় যন্ত্রের উপর যার অধিকার থাকবে, সে প্রতিনিধি বা পুঁজিপতি, যাই হোক না কেন, আসল ক্ষমতা

তারই হাতে থাকবে এবং সে যেন-তেন-প্রকারেণ সর্ববিধ সাধনকে নিজ অভিরুচি অনুযায়ী ব্যবহার করে জনসাধারণের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখবে। অতএব উৎপাদন এবং শাসন দুইয়েরই উপর প্রজাদের কেবল বৈধানিক নয় বাস্তবিক অধিকার হওয়া দরকার এবং কেন্দ্রীয় যন্ত্রকে বিকেন্দ্রীত করে তাকে জনসাধারণের হাতে সমর্পণ করা প্রয়োজন। কিন্তু উৎপাদন-যন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণ না হলে শাসন-যন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণ হতে পারে না। অর্থাৎ শাসন এবং উৎপাদন উভয়ই বিকেন্দ্রীত হয়ে প্রত্যক্ষরূপে জনসাধারণের হাতে আসলেই যথার্থ গণতন্ত্রের স্থাপনা হতে পারে।

কার্লমার্ক্সএর একদল অনুগামী একথা মানেন না। তাঁরা গণতন্ত্রের উপর বিশ্বাস করেন। তাঁরা বলেন, স্টালিন মার্ক্সবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার ফলে রাশিয়ায় সমষ্টিবাদজনিত স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গণতন্ত্রের উপর বিশ্বাসী মার্ক্সএর এই সকল সমাজবাদী অনুগামীরা পার্লামেণ্টারী পদ্ধতির প্রতি আস্থাশীল। তাঁরা ভূমি এবং শিল্প-ব্যবসায়ের রাষ্ট্রীয়-করণ করে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র চালাতে চান। অর্থাৎ তাঁরা রাজনীতিতে সরকারী দলের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিরোধী দলও রাখতে চান। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে বিরোধী দল সর্বদা সরকারী দলকে শাসন-ক্ষমতা থেকে অপসারিত করে স্বয়ং স্বস্থাধিরূঢ় হবার প্রয়াস করেন। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে তাঁদের প্রতিনিয়ত জনসাধারণের সমক্ষে এই কথা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতে হবে যে, সরকারী ব্যবস্থা অকেজো বলে তাঁদের ভোট না দিয়ে যেন বিরোধী দলকে ভোট দেওয়া হয়। কেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে ভূমি এবং শিল্প-ব্যবসায়ের রাষ্ট্রীয়করণের অর্থ হচ্ছে সরকার দ্বারা উভয়ের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। এর অর্থ এই হয় যে, জনসাধারণের নিত্য-নৈমিত্তিক বস্তুর বিতরণ সরকারের পক্ষ থেকেই হবে। বিরোধী দল সম্ভবতঃ সরকারকে অকর্মণ্য প্রতিপন্ন করার জন্য এই ব্যবস্থায় গোলযোগ সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে। কোন সরকার এরকম ব্যবস্থা বরদাস্ত করতে

পারে না। তাই ভূমি এবং শিল্প-ব্যবসায়ের রাষ্ট্রীয়করণ করতে হলে স্বভাবতই সরকার বিরোধী দলের অস্তিত্বও রাখবে না। নচেৎ সরকার সুচারুরূপে নিজ ব্যবস্থা চালাতে পারবে না। অতএব একথা সুস্পষ্ট যে সরকারী দল রাজনীতির ক্ষেত্রে একাধিপত্য স্থাপন করার পরই তাদের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে আর্থিক দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। তাই রাশিয়াতে যে স্বৈরতন্ত্রী একনায়কত্ব চলছে, তা স্টালিনের বিকৃত মস্তিষ্কের ফল নয়। এ হচ্ছে কেন্দ্রীকরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। এইজন্য আমি আগেই বলেছি যে বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া গণতন্ত্র স্থাপনা করা অসম্ভব।

স্বাধীনতা : সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ

কেন্দ্রীয় শাসন এবং উৎপাদন-যন্ত্র প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের হাতে আসার অর্থ জনসাধারণ নিজ জীবনের আবশ্যকতার পরিপূর্তি এবং সমাজ-ব্যবস্থা পরিচালনার ব্যাপারে স্বাবলম্বী হবে। অতএব শাসন-যন্ত্র ও উৎপাদন-যন্ত্রের সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণের নামই জনসাধারণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং জনসাধারণ পূর্ণরূপে স্বাধীন হলে কেন্দ্রীয় শাসন অথবা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার কোন আবশ্যকতা থাকে না।

সমষ্টিবাদীরাও এই কথা বলেন। তাঁরাও চান যে পৃথিবী শাসনহীন হোক। কিন্তু এরকম হবে কি করে? সব কিছু কেন্দ্রীয় শাসনাধীন রেখে প্রতিনিয়ত কেন্দ্রকে শক্তিশালী করতে থাকলে কি কেন্দ্রীয় শাসনের অবসান ঘটবে?

হিংসার সমাপ্তির জন্য শাসনের পরিসমাপ্তি হওয়া প্রয়োজন

যাঁরা অহিংস সমাজরচনার কথা চিন্তা করেন তাঁদের মতেও শাসন অর্থাৎ সরকারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়া প্রয়োজন। প্রথমেই বলা হয়েছে যে বিভিন্ন ব্যক্তির পৃথক পৃথক ছোট ছোট হিংসাকে দমন করার জন্যই এক বৃহৎ হিংসারূপী শাসন-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। শাসনের কাজ হচ্ছে জনসাধারণকে দমন করে তাদের নিয়ন্ত্রিত করা অর্থাৎ **শাসন-যন্ত্রের**

স্বরূপ স্বভাবতঃই হিংসাত্মক। এইজন্য পৃথিবীতে হিংসার অবসান করার জন্য বিশ্ব থেকে যাবতীয় সরকারের নাম মুছে ফেলা প্রয়োজন। সরকারের হাতকে শক্তিশালী করে এ অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না। এজন্য সমাজকে স্বশাসন ও স্বব্যবস্থার যোগ্য হতে হবে। এই যোগ্যতা জনসাধারণের ভিতর তখনই আসতে পারে যখন তারা নিজের দৈনিক ক্রিয়াকলাপে স্বাবলম্বী হবে।

কিন্তু এর উপায় কি?

বহু যুগ ধরে মানুষ কোন ব্যক্তি, শ্রেণী বা দল দ্বারা পরিচালিত হতে অভ্যস্ত। মনুষ্যচরিত্রে স্বাবলম্বনের বৃত্তি অথবা যোগ্যতা কিছুই অবশিষ্ট নেই। তাই শুধু এইটুকু বলা যথেষ্ট নয় যে শাসনসংস্থা সমাজের পক্ষে কেবল অনাবশ্যক নয়, উপরন্তু হানিকারক এবং তাই তার অবলুপ্তি করা প্রয়োজন। এজন্য সমগ্র সমাজ-সংস্কারের পরিবর্তন করা আবশ্যক। নতুবা ইউরোপে প্রিন্স ক্রপটকিন প্রভৃতির নেতৃত্বে পরিচালিত নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন যেমন ব্যর্থ হয়েছিল, এই শাসনহীন সমাজ রচনার চেষ্টাও তেমনি বিফল হয়ে যাবে। স্বাবলম্বনের আর্থিক, সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক ও মনোবৈজ্ঞানিক প্রস্তুতি না করে শুধু গায়ের জোরে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিলে সমাজে "নৈরাজ্য স্বাতন্ত্র্য" স্থাপিত না হয়ে "স্বেচ্ছাচারী অরাজকতার" প্রসার হবে এবং মানুষ তখন অতিষ্ঠ হয়ে কোন স্বৈরতন্ত্রীর হাতে আত্মসমর্পণ করবে।

স্বেচ্ছাচারিতা এবং স্বাতন্ত্র্য

এইরূপ স্বেচ্ছাচারের পরিস্থিতি প্রথমে তো ছিলই; কিন্তু সেই স্বেচ্ছাচারিতার ফলে পারস্পরিক হিংসা সৃষ্টি হয় এবং সমগ্র সমাজ সঙ্কটাপন্ন হয়। সমাজকে তাই শাসনহীন করতে হলে মানুষের ভিতর স্বেচ্ছাচারের পরিবর্তে স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ হওয়া প্রয়োজন। জনসাধারণের মধ্যে

স্বতন্ত্রতার যোগ্যতা না আসা পর্যন্ত তারা স্বতন্ত্র থাকতে পারবে না। এই জন্য জনসাধারণের মধ্যে স্বাবলম্বী বৃত্তি সৃষ্ট হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য

উপরিউক্ত স্থিতি তখনই হওয়া সম্ভব, যখন আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি এমন হবে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ভৌতিক প্রয়োজন পূর্তির জন্য যথেষ্ট স্বাবলম্বী এবং সমাজ-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করবে। কারণ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষকে সামাজিক উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য উপযুক্ত করে তোলা।

নঈ তালিম ঃ উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি

নঈ তালিমের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গান্ধীজী এক সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ করেছিলেন। তিনি সামাজিক পরিবেশ এবং প্রকৃতি পরিচয়ের সঙ্গে শ্রম-শিল্পকে এই শিক্ষা-পদ্ধতির মাধ্যম করেছিলেন। মানুষ স্বয়ং নিজ আবশ্যকতার পরিপূর্তি করতে সক্ষম না হওয়া অবধি স্বাবলম্বী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এই অভীষ্টসাধনের জন্য বাল্যকাল থেকেই মানুষকে কারিগরীতে অভ্যস্ত হতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার শাস্ত্রীয় জ্ঞানও অর্জন করতে হবে। প্রাচীন যুগেও কুটীরশিল্পের দ্বারাই উৎপাদন হত ; কিন্তু সে যুগের কারিগরদের শাস্ত্রীয় জ্ঞান থাকত না। ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র দুই পৃথক বর্ণে সমাজ বিভক্ত থাকায় জ্ঞান এবং উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় স্থাপিত হয়নি। অভিজ্ঞতার অভাবে জ্ঞান রসাতলে গেছে এবং শাস্ত্রীয় জ্ঞানের অভাবে শিল্প-ব্যবসায় জড় হয়ে গেছে। একথা সত্য যে, সমাজ এক নির্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতর থেকেই আবশ্যকতার পরিপূর্তি করে নিত এবং তাই সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে স্বাবলম্বী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবস্থা ও সমাজ-সঞ্চালন ইত্যাদি একটি বিশেষ শ্রেণীর হাতে থাকায় জনসাধারণ স্বাবলম্বী হয়েও স্বাধীন

ছিল না। বাল্যকাল থেকেই তাদের প্রত্যেক ব্যাপারে কেন্দ্রীয় শক্তির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত। এইজন্য গান্ধীজী কুটীরশিল্প প্রবর্তন দ্বারা জনসাধারণকে নিজেদের ভৌতিক আবশ্যকতা সম্বন্ধে স্বাবলম্বী করার সঙ্গে সঙ্গে কুটীর-শিল্প পরিচালনকলার মাধ্যমে জনসাধারণের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ দ্বারা তাদের সুবিকশিত, জাগ্রত এবং স্বাধীন নাগরিকে পরিণত করতে অভিলাষী ছিলেন। এইভাবে শিল্প আধারিত প্রক্রিয়া দ্বারা জনসাধারণকে বস্তু এবং বিষয়ের জ্ঞান দিয়ে গান্ধীজী তাদের ভিতর সামাজিক এবং রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত রাখার পরিকল্পনা করেছিলেন। এই পদ্ধতিতে জনসাধারণের বৌদ্ধিক এবং সামাজিক বিকাশ এত স্পষ্টভাবে হয় যে তারা কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী না হয়েই সামাজিক এবং আর্থিক সমস্যা-সমূহের সময়ানুকূল সমাধান আবিষ্কার করে পরিবর্তনশীল জগতে নিজেদের প্রগতি কায়েম রাখতে পারে। সাধারণতঃ জনসাধারণের ভিতর এবম্বিধ যোগ্যতার অভাব হওয়ার জন্য তারা বিশেষজ্ঞদের করকবলিত হয়ে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়। এইজন্য শ্রমশিল্পবৃত্তি এবং বিজ্ঞানকে মনুষ্য-জীবনের একটি অঙ্গে পরিণত করা প্রয়োজন। বাল্যকাল থেকে এর জন্য সক্রিয় ও সচেতন প্রযত্ন হলে এবং এইভাবে নিরন্তর প্রচেষ্টা দ্বারা মনুষ্য, স্বভাবে স্বাবলম্বনের সংস্কার দৃঢ়মূল হলে উপরিউক্ত আদর্শে উপনীত হওয়া সম্ভবপর। এই হচ্ছে গান্ধীজীর নঈ তালিমের উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি।

নঈ তালিমের আবশ্যকতা

রূপকথায় শোনা যায় যে, একদল রাক্ষস নিজেদের জীবন একটি ভ্রমরের মধ্যে রেখে পরম নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াত। একদিন এক রাজকুমার রাক্ষসদের অনুপস্থিতিকালে ঐ ভ্রমরটিকে হাতের মুঠোর মধ্যে পুরে ফেললেন। রাক্ষসদের প্রাণ হাতের মুঠোর মধ্যে আসা মাত্র রাক্ষসরাও স্বভাবতঃ রাজপুত্রের মুঠোর মধ্যে এসে গেল। সুতরাং তারপর থেকে রাজকুমার

অবাধে রাক্ষসদের উপর চিরকাল রাজত্ব করতে লাগলেন। এটি একটি গল্প হলেও এর থেকে একটি বড় শিক্ষা পাওয়া যায়। জনসাধারণ কোন কারখানার চিমনী অথবা ট্রাক্টরের চাকারূপী ভ্রমরের ভিতর নিজেদের প্রাণ গচ্ছিত রেখে নিশ্চিন্ত হলে তাদের নিশ্চিন্ততার অবসরে কেউ না কেউ এই ভ্রমরকে নিজের মুঠোর মধ্যে পুরে নিয়ে তাদের উপর রাজত্ব করতে সুরু করবে। এইজন্য জনসাধারণের কর্তব্য হচ্ছে নিজ প্রাণ নিজের শরীরের মধ্যেই রাখা অর্থাৎ জীবননির্বাহের জন্য আবশ্যকীয় বস্তু নিজের শরীর-শ্রম দ্বারা উৎপন্ন করা। কিন্তু একাজে জনসাধারণের যদি কষ্ট হয় ও তারা যদি উৎপাদনের কাজে আনন্দ না পায় বা ঐ কাজে অযথা বহু সময় লিপ্ত থাকার জন্য তাদের মনে যদি বিরক্তির উদ্রেক হয়, তবে তারা সম্ভবতঃ এই কষ্টলব্ধ স্বাধীন জীবন যাপন অপেক্ষা কিছু সুযোগ-সুবিধার জন্য পরাধীন থাকাকে অধিক পছন্দ করবে। এইজন্য হস্তশিল্প কলাত্মক, ত্বরিৎগতি ও সহজ কৌশলযুক্ত হওয়া প্রয়োজন এবং হস্তশিল্প পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে সে কাজের বৈজ্ঞানিক রহস্য এবং আর্থিক ও সামাজিক আধারও কর্মীদের কাছে স্পষ্ট হওয়া দরকার। বাল্যকাল থেকে এর অনুশীলন করলে এই কৌশল সহজসাধ্য হবে। নঈ তালিমের দ্বারা কেবল এর অনুশীলন দৃঢ়ই হয় না, উপরন্তু এই অনুশীলনের আবশ্যকতা ও তার অন্তর্নিহিত রহস্যেরও সচেতন অনুভূতি হয়।

নঈ তালিম দ্বারা সমাজ-বিজ্ঞানের জ্ঞান হয়

এই শিক্ষাপদ্ধতিতে সামাজিক পরিবেশকেও শিক্ষার মাধ্যমে পরিণত করা হয়েছে। এইভাবে শিশুরা প্রথম থেকেই সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সমাজব্যবস্থা এবং পরিস্থিতি অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের মধ্যে সমস্যা সমাধানের শক্তি সৃষ্ট হয়। কারণ শিশু-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে যে কোন মানুষের মস্তিষ্ক কোন সমস্যা নিয়ে বিচার করতে

আরম্ভ করলে তার ভিতর স্বভাবতঃই সমস্যার শেষ পর্যন্ত পৌছাবার প্রবৃত্তি সৃষ্টি হয়। এইজন্য নঈ তালিমের ছাত্রদের সমাজবিজ্ঞানের অনুশীলন হয় এবং তারা নিজেদের কাজকর্ম পরিচালনার ভার সহযোগিতার ভিত্তিতে স্বয়ং গ্রহণ করার যোগ্য হয়ে উঠে।

স্বয়ং বিকেন্দ্রীকরণ

শিক্ষা সার্বজনীন হওয়ার জন্য সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যখন স্বাবলম্বী উৎপাদক ও স্বাবলম্বী ব্যবস্থাপক হতে আরম্ভ করে, তখন ধীরে ধীরে তারা শাসনকে পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করতে সমর্থ বলে প্রমাণিত হয়। জনসাধারণ নিজ আবশ্যকতা-পূর্তি ও সমাজের বিলি ব্যবস্থা স্বয়ং করে নিলে আর কোন কেন্দ্রীয় শাসনের উপর নির্ভর করবে কেন? এইভাবে সমগ্র সমাজ স্বয়ং বিকেন্দ্রীত হয়ে যায়।

গান্ধী এবং সমষ্টিবাদ

সমষ্টিবাদীরাও জনসাধারণকে স্বাধীন এবং সমাজকে শান্তিময় করার জন্য পৃথিবীতে শাসনহীন সমাজ স্থাপনা করতে চায়। কিন্তু তাঁদের পথ গান্ধীপন্থা থেকে পৃথক। তাঁরা শাসনযন্ত্রকে উত্তরোত্তর দৃঢ়মূল করেই শাসনকে বিলুপ্ত করতে চান। গান্ধীজী বলেন যে আমাদের যেদিকে যেতে হবে, সে দিকেই আমাদের গতি হওয়া উচিত। বিপরীত দিকে চলে কেউ কখনও গন্তব্য স্থলে উপনীত হতে পারে না। অতএব লক্ষ্য যদি শাসন-বিলুপ্তি হয়, তবে শাসনকে সংগঠিত করে সে উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া অসম্ভব। বিলুপ্তি-ক্রিয়া তো বিলোপের পথেই সম্ভব। তাই শেষ পর্যন্ত যাতে শাসনের পরিধি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং জনসাধারণ যাতে শাসন-চক্রের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণভাবে স্বাবলম্বী হয়, তার জন্য গান্ধীজী নঈ তালিম দ্বারা জনসাধারণকে নিজ আবশ্যকতা সমূহের পরিপূর্তি ও সমাজ-ব্যবস্থা সঞ্চালনক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করতে অভ্যস্ত করিয়ে শাসনের পরিধি

ক্রমশঃ হ্রাস করার পক্ষপাতী ছিলেন। এই উপায়ে লাভ এই হয় যে, এই বিলুপ্তি-ক্রিয়ার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের স্বাধীনতারও বৃদ্ধি হতে থাকে এবং অবশেষে তারা পরিপূর্ণ স্বাধীন হয়ে যায়। কিন্তু আমরা যদি শাসনকে ক্রমশঃ অধিকতর মাত্রায় সংগঠিত করার পথ অবলম্বন করি, তাহলে যে পরিমাণে এই সংগঠন ঘনীভূত হতে থাকবে, জনসাধারণের স্বাধীনতাও স্বভাবতঃ সেই পরিমাণে হ্রাস পেতে থাকবে। এই সাধারণ বুদ্ধির কথা বাদ দিলেও এ কথা বুঝে উঠতে পারা যায় না যে এই প্রকার অতিসংগঠিত কেন্দ্রীয় শাসন-যন্ত্র কবে এবং কিরূপে নিজ-কার্য সম্পন্ন করে স্বয়ং শিথিল হয়ে প্রজাকে মুক্তি দেবে। বলা যেতে পারে যে, এই কেন্দ্রীয় শাসনের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির পর প্রকৃতির নিয়মানুসারে অবশেষে তার পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি হবেই। এই বৈজ্ঞানিক নিয়ম প্রত্যেক স্থলেই প্রযোজ্য। কিন্তু এ এক বৈজ্ঞানিক আদর্শসম্মত স্থিতি এবং এ হবে সমাজের অন্তিম অবস্থা ও এর পর সমাজের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। সেই সময় প্রজারা মুক্তি পেয়েই বা কি করবে? অনন্তকালের পর আদর্শ স্থিতিতে পৌছে, তাদের কি অবস্থা হবে এ বিষয়ে জনসাধারণের কোন আগ্রহ নেই; তারা বরং এই বিষয়ে অধিকতর আগ্রহশীল যে সেই আদর্শ স্থিতিতে উপনীত হবার যাত্রাপথে তাদের কি অবস্থা দাঁড়াবে? বস্তুতঃ আদর্শ তো জ্যামিতির বিন্দুর মত কল্পনার বিষয়, এ স্থূল দৃষ্টিগোচর নয়। এইভাবে গান্ধী এবং মার্ক্স্‌এর পরিকল্পনার পার্থক্য স্বয়ং বোঝা যায়। সমষ্টিবাদী পরিকল্পনাতে জনসাধারণ সংগঠিত কেন্দ্রের বজ্র-মুষ্টির ভিতর নিস্পন্দ হয়ে পড়ে; পক্ষান্তরে গান্ধীজীর পরিকল্পনায় তারা শাসন-বন্ধনকে ভঙ্গ করতে করতে ও নিজ-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে করতে অগ্রসর হয়।

আদর্শ এবং বাস্তব

সমষ্টিবাদীরা বলেন যে প্রথমে শাসনকে যতদূর সম্ভব অধিক পরিমাণে সংগঠিত করে জনসাধারণের স্বার্থবুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করা দরকার এবং তারপর শাসনের মাত্রা পূর্ণ হয়ে গেলে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মানুসারে এই দৃঢ়মূল শাসন স্বয়ং বিলুপ্ত হবে ও জনসাধারণ তখন শাসন-বন্ধনমুক্ত হবে। কিন্তু এ হচ্ছে নিছক কল্পনা (utopia)। বাস্তবের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই। কারণ আদর্শ হচ্ছে অন্তিম অবস্থা এবং তাই আদর্শ ধরাছোঁয়ার বস্তু অর্থাৎ প্রাপ্তব্য নয়। যতই ঐদিকে অগ্রসর হওয়া যায় ততই মরুভূমির মরীচিকার মত এই আদর্শ দূরে সরে যায়। বাস্তবতা তাকেই বলে, যে পথ গ্রহণ করলে চেষ্টার প্রগতির ভিতরই উদ্দেশ্য-পূর্তির প্রগতি অনুভূত হয়।

অভ্যাস ও স্থায়িত্ব

কেবল কল্পনারাজ্য বা স্বপ্ন-লোকে বিচরণ করলেও পূর্বোক্ত বিচার-ধারাকে যুক্তিসংগত বলা যায় না। ধরে নেওয়া গেল যে, শাসন-সত্তার তরফ থেকে পৃথিবীর যথাসর্বস্বের উপর কর্তৃত্ব জারী করে কেন্দ্র দ্বারা সমাজের যাবতীয় ব্যবস্থা করা হল এবং অতঃপর এই শাসন পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হলে মানব-সমাজের অস্তিত্ব-কালেই তা শুকিয়ে গেল। কিন্তু সে অবস্থাতেও সমস্যা দাঁড়াবে এই যে, জনসাধারণের উপর থেকে যেদিন অকস্মাৎ শাসন-বন্ধন অপসারিত হবে, সেদিন তারা সম্পূর্ণভাবে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে যাবে। সমস্ত কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব কেন্দ্রের হাতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্তে পড়ে থাকার পর হঠাৎ একসঙ্গে সব কাজ চালাবার প্রেরণা-শক্তি কোথা থেকে আসবে? বিজ্ঞানের এক বিশেষ নিয়ম হচ্ছে এই যে, কোন শক্তির চর্চা না করলে তা পঙ্গু হয়ে যায়। এইজন্য সমাজ যদি সেই কল্পিত স্বাধীনতা পায়ও, তথাপি জনসাধারণের ভিতর প্রেরণা-শক্তির অভাবের কারণে সে সমাজ চলতে পারে না।

নঈ তালিম—একমাত্র বৈজ্ঞানিক পথ

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নঈ তালিম দ্বারা জনসাধারণ স্বাবলম্বী, শান্তিপূর্ণ ও অহিংস পন্থায় বিশ্বকে সফলতাপূর্বক শাসনহীনতার দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম। এই পথ অধিকতর বৈজ্ঞানিক, অধিকতর বাস্তব বুদ্ধি যুক্ত, অধিকতর সুনিশ্চিত। এই পথে জনসাধারণকে কোন অনন্তকালের পর মুক্তি পাবার আশায় বসে থাকতে হয় না, বরং নিজ-প্রেরণা এবং স্বীয় চেষ্টা দ্বারা অগ্রসর হবার সুযোগ তারা সর্বদা পেয়ে থাকে।

(৪)
আর্থিক এবং সামাজিক আধার

নঈ তালিম দ্বারা গান্ধীজী কিরূপে প্রকৃত গণতন্ত্রের স্থাপনা করতে চেয়েছিলেন আমরা তা দেখেছি। বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে রচিত স্বাবলম্বী সমাজের পরিকল্পনা গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক বিরাট বৈপ্লবিক পদক্ষেপ এবং শাসনযন্ত্র থেকে স্বৈরতন্ত্রের ভয় দূর করার এই একমাত্র উপায়। কিন্তু কেবল রাজনৈতিক স্বরাজ দ্বারা সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে জানা যায় যে একাঙ্গী বিপ্লব দ্বারা জনসাধারণ কখনও নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে সমর্থ হয় নি। নিজ আদর্শে উপনীত ও সেই লক্ষ্যে স্থায়িরূপে টিকে থাকতে হলে জনসাধারণকে প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীণ বিপ্লব সাধন করতে হবে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের লক্ষ্যও সর্বাঙ্গীণ বিপ্লবমুখী হওয়া প্রয়োজন। বিপ্লবীরা প্রায়ই উত্তেজনার আবেশে সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টি এবং ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য-বোধ হারিয়ে বিভিন্ন দিশাভিমুখে পদক্ষেপ করেন বলেই এ বিষয়ের উপর এতটা জোর দেওয়া প্রয়োজন। গান্ধীজী এইজন্য প্রথম থেকেই রাজনৈতিক, আর্থিক এবং সামাজিক প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই একসঙ্গে বৈপ্লবিক আন্দোলন আরম্ভ

করেন। অবশ্য ভারতের জাতীয় নেতৃবর্গ এবং জনসাধারণ এই সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনার ততটুকুই বুঝতে পারলেন, যতটুকুর সঙ্গে পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করার সম্পর্ক ছিল এবং এর ফলস্বরূপ তাঁরা তাঁর সমগ্র কার্যক্রমের ভিতর মাত্র জাতীয় স্বাধীনতার অংশটুকুই গ্রহণ করেছিলেন। এর পরিণামে গান্ধীজী যে ত্রিবিধ পরিকল্পনার দ্বারা দেশের রাজনৈতিক জীবনকে সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে, সামাজিক জীবনকে প্রতিক্রিয়াবাদের হাত থেকে এবং আর্থিক জীবনকে পুঁজিবাদের হাত থেকে এক সঙ্গে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, তা আর সম্ভব হল না। দেশ কেবল রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করে রাজনৈতিক মুক্তি পেল এবং অন্য দু'দিক পূর্ববৎ নিষ্ফল থেকে গেল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও কেবল বিদেশী শাসনের পরিসমাপ্তি হয়; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা শোষণের উদ্দেশ্যে যে রাজ্য-ব্যবস্থা ও শাসন-পদ্ধতি সৃষ্টি করেছিল তা অপরিবর্তিত রয়ে গেল। শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ভেবে দেখলেন না যে, ১৯২১ সাল থেকেই অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের অস্ত্র দ্বারা ইংরাজ সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই কেন গান্ধীজী গঠন-মূলক কাজের উপর এত জোর দিতেন এবং কেন তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জনসাধারণের দৃষ্টি এত করে আর্থিক এবং সামাজিক বিপ্লবের দিকে আকর্ষণ করতেন। একদিকে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক অভিনব পদ্ধতিতে পরিচালিত বিপ্লব দ্বারা নবীন রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করার অভিলাষী ছিলেন এবং অন্যদিকে তিনি বিশ্বের প্রচলিত আর্থিক ও সামাজিক পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করে তাকে স্থায়িরূপে শোষণহীন অর্থাৎ অহিংসাত্মক রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছিলেন। অতএব আমাদের নঈ তালিমের আর্থিক এবং সামাজিক আধার সম্বন্ধে যথাযথভাবে বিচার করা প্রয়োজন।

উৎপাদন-যন্ত্রের বিস্তার

পূর্বে সমাজ-ব্যবস্থা এখনকার মত জটিল ছিল না। মানুষ তখন প্রকৃতির কোলে ক্রীড়া করত। প্রকৃতিদেবীর অঞ্চলে সহজে যা কিছু জুটত, মানুষ তাতেই সন্তুষ্ট থাকত। তারপর শ্রম করে, সময় ব্যয় করে, নিজ সাধারণ বুদ্ধি নিয়োগ করে তারা কিছু উৎপাদন করতে আরম্ভ করল। এই ভাবে তারা কৃষি, পশুপালন এবং শিল্প-ব্যবসায় দ্বারা নিজেদের উপভোগ-সামগ্রীর পরিধি সম্প্রসারিত করল। ধীরে ধীরে তারা যখন দেখল প্রকৃতির অনন্ত সম্পদকে উপভোগের কাজে লাগালে জীবনে অধিক আরাম ও সুখ পাওয়া যায়, তখন তাদের তৃষ্ণা বাড়তে লাগল। তাদের মনের সন্তোষভাব লুপ্ত হল। তারা অধিকতর মাত্রায় উৎপাদন করার ফন্দি-ফিকির খুঁজে বেড়াতে লাগল এবং এর জন্য নানা প্রকার উৎপাদন-যন্ত্র সৃষ্টি করল। যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে মানবসমাজে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু-প্রাপ্তির লালসা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রম বাঁচাবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠল। এই লালসা ও আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করার জন্য মানুষ যন্ত্রের আকার-প্রকার অত্যধিক মাত্রায় বিশাল এবং জটিল করতে আরম্ভ করল। বাষ্প, বিদ্যুৎ প্রভৃতি নানা শক্তি ব্যবহার করার উপায় আবিষ্কৃত হল এবং উৎপাদন-পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হল। এক পরিবর্তন আর এক পরিবর্তনের জনক হল এবং দিনে দিনে যন্ত্র বিশাল আকার ধারণ করতে লাগল।

যুগ-সমস্যা এবং মহাপুরুষের আবির্ভাব

সমাজ-ব্যবস্থা উৎপাদন-পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল এবং উৎপাদন-পদ্ধতি উৎপাদনে নিযুক্ত সাধনের স্বরূপ থেকেই সৃষ্টি হয়। এইজন্য যন্ত্রের জটিলতা এবং বিশালতার ফলে উৎপাদন-পদ্ধতি জটিল ও কেন্দ্রীত হল এবং সমাজ-ব্যবস্থাও তাই জটিল ও কেন্দ্রীত রূপ ধারণ করল। কেন্দ্রীত সমাজের

সমস্যাসমূহ ক্রমশঃ জটিল হতে লাগল। এক সমস্যা হতে দ্বিতীয় সমস্যা সৃষ্টি হতে লাগল এবং মানুষ এই সকল সমস্যার সমাধানের অনুসন্ধানে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত হতে লাগল। এই সকল সমস্যার সমাধান করার জন্য বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁরা যুগ ও পরিস্থিতি অনুসারে সমাধান আবিষ্কার করেন। মার্ক্স এবং গান্ধীকে এই সব যুগ-সমস্যার অবদান আখ্যা দিতে হবে।

বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করা দরকার

পূর্ব অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, সামন্তবাদের পর পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদের পর সমষ্টিবাদের উদয় হয়। এসব রাজনৈতিক পরিবর্তনের ভিতর আর্থিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের কারণ অন্তর্নিহিত ছিল, কারণ সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্র আর্থিক সূত্র দ্বারা আবদ্ধ। পূর্বেই বলা হয়েছে যে মানুষের ভিতর অধিক সামগ্রী প্রাপ্তির পিপাসা বৃদ্ধি পাওয়াতে তারা বিশাল কেন্দ্রীয় যন্ত্র আবিষ্কার করে এবং এর থেকেই যাবতীয় কেন্দ্রীকরণের সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল এই যে, এই ভয়ঙ্কর যন্ত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে কি মানবসমাজ অধিক ভৌতিক সামগ্রী প্রাপ্তির উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিমুখে অগ্রসর হতে পেরেছে? সমাজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিকে প্রগতি করলে আর বর্তমান মানবসমাজকে অভাবের পেষণে আর্তনাদরত অবস্থায় দেখতে হত না। তারা বরং সমৃদ্ধ হত। সুতরাং বাস্তব পরিস্থিতিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা দরকার।

(৫)

কেন্দ্রীয় শ্রমশিল্প দ্বারা অনুপভোগ্য এবং অপ্রয়োজনীয় বস্তু সৃষ্টি

বাস্তবিক পরিস্থিতিকে বুঝবার জন্য সর্বপ্রথম আমাদের যথাযথভাবে শ্রমশিল্পের রূপ এবং গুণ বুঝতে হবে। মানুষের মৌলিক আবশ্যকতা দেখে তাদের সুখ-সমৃদ্ধির অনুমান করা যেতে পারে। মোটর গাড়ী, সাবান এবং অন্যান্য সামগ্রীর প্রাচুর্য সত্ত্বেও অন্নবস্ত্র এবং বাসস্থানের অভাব হলে অথবা মানুষের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার সুযোগ না থাকলে সব কিছু পুরামাত্রায় থেকেও জনসাধারণের তাতে লাভের পরিবর্তে ক্ষতি হয়। সকলেই জানেন যে, সকল বস্তু ও পদার্থের আকর হচ্ছে পৃথিবী। পৃথিবীতে যে সকল কাঁচামাল উৎপন্ন হয় তা থেকেই আমাদের ভোগ্য বস্তু প্রস্তুত হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় শ্রমশিল্পের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক অনুপভোগ্য বস্তুর আবশ্যকতাও বেড়ে গেল। বিস্তৃত ভূভাগে উৎপন্ন কাঁচামালকে একটি কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া আবার সেখান থেকে পাকামালকে জনসাধারণের নিকট পৌছাবার কারণে পৃথিবীতে মালপত্র বাঁধার জিনিস বা তার বহিরাবরণের জিনিসপত্রের আবশ্যকতা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া মাল-পত্র এখান থেকে ওখানে পাঠাবার জন্য যে বিরাট পরিবহন-ব্যবস্থা সংগঠন করতে হয়, তার জন্যও এইরূপ অনেক জিনিসের আবশ্যকতা হয়। তারপর শ্রমশিল্পের প্রসার ঘটিয়ে উৎপন্ন পণ্যের কাটতির জন্য শিল্পপতিরা বিশ্বজুড়ে যে জীবনযাত্রার মান উঁচু করার ধূর্ত প্রচার-বন্যা বইয়ে দেন, তার ফলে পৃথিবীতে এমন সব বস্তুর চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে যার দ্বারা হয়ত ভোগবাসনার তৃপ্তি হচ্ছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেইগুলি জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য নয়। কেবল শিল্পপতিদের প্রচারের দ্বারাই নয়, শ্রমশিল্পের কেন্দ্রীকরণরূপী

অপ্রাকৃতিক অবস্থার জন্যও বিলাস-ব্যসন ও মনোরঞ্জনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অনাবশ্যক বস্তুর আবশ্যকতা বেড়ে চলেছে। শ্রমজনিত ক্লান্তি অপনোদনের জন্য বিশ্রাম প্রয়োজন। গ্রামের উন্মুক্ত পরিবেশে সহজেই তা উপলব্ধ হয়। কিন্তু শিল্পকেন্দ্রের ঘন-বসতি এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য বড় বড় শহরের জনসাধারণ এইরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশের রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকে। এই কারণে তারা মনোরঞ্জনের কৃত্রিম সাধনের আবশ্যকতা অনুভব করে। অন্ধকার কুঠরীর ভিতর দিন-রাত বন্ধ হয়ে থাকার ক্লান্তি দূর করে মনে স্ফূর্তি আনতে তাই তাদের আজেবাজে জিনিস সৃষ্টি করতে হয়।

সমাজের দেউলিয়া অবস্থা

এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, বর্তমান শিল্পীকরণের দ্বারা উৎপাদনের গতি হয়ত বাড়তে পারে কিন্তু উৎপন্নের পরিমাণে বিশেষ পার্থক্য হবে না। এক মণ ধান থেকে যতটুকু চাল হওয়ার কথা, তা কলে ভানলেও যা আর ঢেঁকীতে ভানলেও তাই হবে। কারখানা দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি হয় বলে মনে করা এক প্রচণ্ড ভ্রম। বরং ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি যে, শিল্পীকরণ দ্বারা অপ্রয়োজনীয় জিনিসের আবশ্যকতা বৃদ্ধি পায়। এ সবের প্রভাব ঘুরেফিরে জমির উপর পড়ে। এই চাপের সম্মুখীন হবার জন্য জনসাধারণের মৌলিক প্রয়োজনীয় বস্তু ছেড়ে দিয়ে এমন সব পণ্য উৎপাদন করা হয়, কল-কারখানার মানদণ্ডে যা অল্পতে বেশী "পয়সা" দিতে সক্ষম। একে বলে 'মানী-ক্রপ' বা অর্থকরী ফসল। এইরূপে ধরাতল শস্য-শীর্ষের স্বর্ণশোভা-বিহীন হয়ে ইক্ষু এবং পাটের আঁশের ফাঁসি পরে, ধরণী ধান্যগুচ্ছের পরিবর্তে নারিকেলবৃক্ষের নিগড়ে আবদ্ধ হয়। এই ভাবে বাংলার ভীষণ দুর্ভিক্ষ যখন মানবতাকে করাল গ্রাসে কবলিত করার

জন্য উদ্যত, তখন আমাদের কাছে শেষ পর্যন্ত খাদ্যশস্যের পরিবর্তে পাটের খালি বস্তা ও হামাম সাবানের টুকরাই থেকে যায়। সমাজের বৌদ্ধিক দেউলিয়া অবস্থার স্পষ্টতর নিদর্শন আর কি হতে পারে ?

ভয়ঙ্কর আর্থিক উপহাস

এইভাবে বাংলাদেশে ধানের জমি পাটের কবলে চলে যাচ্ছে। বিহার ও উত্তর প্রদেশের গমের ক্ষেত আখের পেটে যাচ্ছে। মাদ্রাজের ধানের জমি নারিকেল বাগানে এবং অন্ধ্রের শস্যশ্যামল ভূভাগ তামাকের জমিতে পরিণত হচ্ছে। যাতে অধিক পরিমাণে মিঠাই, সাবান, বিড়ি এবং সিগারেট প্রভৃতি উৎপাদন হতে পারে তার জন্যই এই সব হচ্ছে। ফলে একদিকে দেশে যদি অপ্রয়োজনীয় বস্তুর প্রাচুর্য এসে থাকে তবে অন্যদিকে অন্ন-সঙ্কটের কারণে জনসাধারণের অবস্থা বিপর্যস্ত। আজ দিল্লীর রাস্তায় ছয় পয়সার সুন্দর চিরুনি যত খুশি পাওয়া যায়; কিন্তু একটাকায় বার ছটাক চাউল পাওয়া মুস্কিল। তাহলে এ কিরকম প্রাচুর্য ? এ কী ভয়ঙ্কর আর্থিক উপহাস ?

অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা

গত দুইশত বৎসর যাবৎ অনবরত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রাচুর্যের এই মরীচিকা মানুষের আয়ত্তে আসছে না। বরং সমাজে অনেক জটিল সমস্যা সৃষ্ট হয়ে বিশ্বযুদ্ধরূপে ঘনীভূত হতে চলেছে। পৃথিবী মহাপ্রলয়াবর্তে নিমজ্জিত হবার সীমায় উপনীত হয়েছে। নিঃসন্দেহে অতীব শোচনীয় অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

কেন্দ্রীকরণ : যুদ্ধ এবং সংঘর্ষের জনক

যুদ্ধ প্রাচীনকালেও হত ; কিন্তু তখনকার যুদ্ধ কেবল রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য হত। কারণ বিজেতার প্রভুত্ব স্বীকার করে বলেই যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু যুদ্ধের গণ্ডী জনসাধারণের আর্থিক ও সামাজিক জীবনকে বেষ্টন করার পর স্বভাবতঃ যুদ্ধের জন্য জনসাধারণের জীবনে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হল। লোক-জীবনের আর্থিক ও সামাজিক স্বাবলম্বন নষ্ট হয়ে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার গর্ভ থেকে এই স্থিতি সৃষ্ট হয়। সম্পত্তির বিকেন্দ্রীকরণ হয়ে গেলে দৈনন্দিন সুরক্ষার প্রয়োজন হয় না বা যুদ্ধের সমস্যাও এত জটিল হয় না। সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত সম্পদ সংগ্রহ করে কেন্দ্রে স্তূপীকৃত করলে স্বভাবতই তার উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। অর্থাৎ যে হারে ক্রমশঃ সম্পত্তির কেন্দ্রীকরণ হয়, সেই হারে তার উপর অন্যের আক্রমণের আশঙ্কা অর্থাৎ তার রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা বাড়তে থাকে। প্রতিরক্ষার সমস্যা জটিল হবার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যসামন্ত এবং অস্ত্রশস্ত্রের বৃদ্ধিও অনিবার্য হয়ে পড়ে। কেবল কেন্দ্রীত সম্পত্তির রক্ষার্থেই যে যুদ্ধ হয় তা নয়। শিল্পীকরণের ফলে কাঁচামালের অন্বেষণ এবং তা থেকে প্রস্তুত মাল বিক্রয়ের জন্য বাজার দখল করার প্রচেষ্টাতেও যুদ্ধ হয়ে থাকে। এই হচ্ছে যুদ্ধের মনোভাব এবং যুদ্ধের কারণ-সৃষ্টির পৃষ্ঠভূমি।

প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়মানুসারে প্রত্যেক প্রাণীর বিশেষ বিশেষ স্বভাব ও স্বধর্ম হয়ে থাকে। সম্পত্তির কেন্দ্রীকরণ হওয়াতে তার সুরক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী এবং অস্ত্রশস্ত্রের মাত্রার যে বৃদ্ধি হয়, যুদ্ধবৃত্তিই তার অনিবার্য স্বধর্ম। এই স্বধর্ম যুদ্ধ বাধাবার কোন-না-কোন কারণ অন্বেষণ করে। অন্য কোন কারণ না পাওয়া গেলে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্যই যুদ্ধ সুরু হয়। কোন স্থানে পুঞ্জীভূত সম্পত্তির উপর কারও আক্রমণ হলে তা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতেই হয়। এ হচ্ছে মানুষের স্বধর্ম এবং স্বভাব। আজ এই আত্মরক্ষার

অজুহাতে সারা পৃথিবীতে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শস্ত্রীকরণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়েছে। এর জন্য নৈতিক কারণও আবিষ্কার করা হয়। কখনও অন্যের উপর নিজেদের ধর্মমত চাপিয়ে দেবার জন্য অর্থাৎ তার আত্মার কল্যাণ কামনায় এবং কখনও অপরের উপর নিজের "বাদ" চাপাবার জন্য যুদ্ধ করা হয়। কারণ কেউ যদি নিজের শুভাশুভ বুঝতে না পারে, তাহলে মধ্যযুগে যেমন কলুষিত আত্মাকে মুক্তি দেবার জন্য জীবন্ত দগ্ধ করা প্রয়োজন হত, তেমনি এযুগেও তাকে গুলি মেরে তার মঙ্গল করতে হবে।

শ্রমশিল্পবাদ এবং যুদ্ধের দুষ্টচক্র

এইভাবে যুদ্ধ যখন পৃথিবীতে এক স্থায়ী আবশ্যকতা রূপে প্রতিপন্ন হয়, তখন জমির উপর চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারণ যুদ্ধের জন্য খাদ্য-সামগ্রী অপেক্ষা যুদ্ধ-সামগ্রী উৎপাদন করা অধিকতর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। শুধু জমি এর জন্য আটকা পড়ে না, উৎপন্ন খাদ্য-পদার্থকেও যুদ্ধোপকরণ সৃষ্টির জন্য নিয়োগ করতে হয়। এতদ্ব্যতিরেকে সাফল্যসহকারে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন শ্রমশিল্পের সম্প্রসারণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এইভাবে আজ পৃথিবীতে এক ভয়ঙ্কর দুষ্টচক্র প্রবর্তিত হয়েছে—শ্রমশিল্পের বিস্তার। সেই সম্প্রসারিত শ্রমশিল্প রক্ষার্থে যুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য শিল্প-বিস্তার। এই দুষ্টচক্র পৃথিবীকে এমনভাবে আবেষ্টন করে রেখেছে যে, কারও আর অন্যদিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশ নেই। ফলতঃ আজ পৃথিবীর যাবতীয় শক্তি (শারীরিক এবং মানসিক) এই চক্রের চক্রান্তে আটকা পড়েছে এবং মূক জনসাধারণ জীবনধারণের জন্য আবশ্যকীয় বস্তুর অভাবে ত্রাহি ত্রাহি করছে। ঔদ্যোগিক রাষ্ট্রে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কাঁচামালের চাহিদার তুলনায় কম পড়লে ঐ সকল রাষ্ট্রের দৃষ্টি অন্যদেশের উপর পড়ে। তখন ঐ সকল

দেশ দখল করা ছাড়া তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না এবং এই কারণে আবার যুদ্ধ সুরু হয়। কেবল যুদ্ধই নয়, শ্রমশিল্পের বিস্তারের ফলে পৃথিবীতে নানা প্রকার দুর্নীতিপূর্ণ ব্যবসাও চলে। ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়ের কলের খোরাক জোগাড় করার জন্য লম্বা আঁশের কাপাস চাই। সস্তায় সেই কাপাস চাষের জন্য আমেরিকাতে কিভাবে জঘন্য দাস-ব্যবসায়ের বিস্তার হয় এবং বস্ত্র-শিল্পের কেন্দ্রগুলিতে কিভাবে মজুরদের প্রতি অত্যাচার হত, সেকথা ইতিহাসের কোন্ পাঠকের জানা নেই? আজও এত শ্রমিক-সংগঠন ও শ্রমিক-আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও এক্ষেত্রে বিশেষ কোন নৈতিক প্রগতি হয়েছে বলে মনে হয় না। স্বাধীন শ্রমিকদের তুলনায় দাস-শ্রমিক পোষা যখন অধিক ব্যয়বহুল প্রতীয়মান হল, তখন দাস-প্রথা স্বয়ং বিলুপ্ত হল। কিন্তু যন্ত্রের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, বেকার-সমস্যা বেড়েই চলল এবং তার পরিণামে শ্রমিকদের উপর অত্যাচারও বৃদ্ধি পেতে লাগল। এর করুণ কাহিনী প্রত্যহ সংবাদপত্রে দৃষ্টিগোচর হয়। মালিক এবং শ্রমিকদের ভিতর সংঘর্ষ বেড়েই চলেছে। সামাজিক স্থিতি প্রত্যহ অধিকতর মাত্রায় অনিশ্চিত হচ্ছে। ফলে যুদ্ধই লাগুক বা শান্তিকালীন অবস্থাই চলুক—পৃথিবী থেকে সংঘর্ষের অবসান হচ্ছে বলে দেখা যাচ্ছে না। সমগ্র সৃষ্টি যেন যুদ্ধময় হয়ে পড়ছে! যুদ্ধের সময় যুদ্ধ ত চলেই, যখন যুদ্ধ বন্ধ থাকে তখনও সংঘর্ষরূপী আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ-পরম্পরাও চলতে থাকে, আজ তো পৃথিবীর বহু জায়গায় অন্তর্বিপ্লবের নামে আন্তর্জাতিক যুদ্ধও চলছে। এই সবের কারণে সমাজের নৈতিক স্তর অধোগামী হয়ে চলেছে ও দৈন্য-দশা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৬)

স্বাবলম্বন এবং সহযোগ

জনসাধারণ যখন স্বাবলম্বী ছিল তখন তারা শান্তিতে নিজেদের দৈনিক আবশ্যকতা পূর্ণ করে নিত। মানুষকে নিজ শ্রমে নিজ আবশ্যকতার পূরণ করতে হলে একা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে শুধু তার নিজ হাতের শক্তির বলে যাবতীয় আবশ্যকীয় বস্তু উৎপাদন করা মুস্কিল। অতএব স্বাবলম্বী সমাজ-ব্যবস্থার জন্য সহযোগী পদ্ধতিতে সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালন প্রয়োজন; বস্তুতঃ উৎপাদন-পদ্ধতি অনুসারেই সামাজিক ব্যবস্থার রূপরেখা নির্মিত হয়। আমরা যখন স্বাবলম্বী পদ্ধতিতে উৎপাদন করতাম তখন সমাজের যাবতীয় কাজকর্ম পূর্বোক্ত সহযোগিতার ভিত্তিতে চলত। সহযোগিতার অর্থ সমাজের প্রত্যেক সদস্য পরস্পরের প্রতি ভরসা রাখবে অর্থাৎ তারা মনুষ্যত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। মানুষের ভিতর সততা থাকলে অর্থাৎ কেউ কাউকে প্রতারণা না করলেই শুধু সহযোগী সমাজ চলা সম্ভব। কারণ, সহযোগিতায় প্রতারণার স্থান নেই ও সহযোগিতা ছাড়া জনসাধারণ স্বাবলম্বী হতে পারে না। সেইজন্য স্বাবলম্বী সমাজে জনসাধারণের নৈতিক স্তর স্বভাবতই উচ্চ থাকে।

কেন্দ্রীভূত সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব

আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণে সমাজের সে স্থিতি থাকে না; জনসাধারণের আবশ্যকতার সামগ্রী শিল্প-ব্যবসায়ের কেন্দ্র দ্বারা এবং সমাজ-ব্যবস্থা রাজকীয় কেন্দ্র দ্বারা বিতরিত হয়ে থাকে। এইরকম পরিস্থিতিতে মানুষ একা থেকে প্রতিবেশীর তোয়াক্কা না করেও নিজের প্রয়োজন পূর্তি করতে পারে। এখানে কাউকে কারও ভরসায় থাকার দরকার হয় না; কারণ সকলেই পৃথক পৃথক কেন্দ্রীয় যন্ত্র ও ব্যবস্থার

ভরসায় থাকে। এই রকম অবস্থায় পারস্পরিক সহযোগ অথবা মানবতা-বন্ধন বিনষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব এখন আর বেঁচে থাকার জন্য পারস্পরিক সম্বন্ধের এতখানি আবশ্যকতা রইল না। তারপর আবার এই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাতে জনসাধারণের আবশ্যকতার পরিপূর্তি কোন জটিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে হতে লাগল। ফলে মূল বিতরণকারী ও জনসাধারণের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রইল না। অতএব সমাজে সকলেই পর হয়ে গেল। স্বতরাং প্রতারণা, লুণ্ঠন ও শোষণ প্রভৃতি বৃত্তির আর লজ্জা-সরমের বালাই থাকে না। আজ সমাজে চোরাবাজারী, প্রতারণা, ঘুষখোরী প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তির বাজার এত গরম যে, মানুষের ভিতর মনুষ্যত্বের সম্বন্ধ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে বললেই চলে। আজ যেন মানবতার কোন অর্থই নেই।

জনসাধারণের নৈতিক পতন

বস্তুতঃ স্বতন্ত্ররূপে কেবল নিজের বিবেকের ভরসায় মানবীয় বৃত্তির পবিত্রতা রক্ষা করা সকলের পক্ষে সহজ নয়। পৃথিবীতে অতি অল্প-সংখ্যক লোকই নৈতিক আধারের উপর জীবনে সত্য, অহিংসা, সততা ও সহযোগ প্রভৃতি সংবৃত্তিকে স্থায়িভাবে রূপ দিতে পারেন। সর্বসাধারণের ভিতর যদি এই সকল সংবৃত্তিকে দৃঢ়মূল করতে হয়, তাহলে ব্যক্তিগত শিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তদনুকূল সমাজব্যবস্থাও হওয়া দরকার। কারণ জনসাধারণের মূল সংবৃত্তিগুলিকে যদি পরিস্থিতি অনুসারে তাদের অপরিহার্য আবশ্যকতা পূর্ণ করার মাধ্যমে জাগ্রত না রাখা হয়, তবে অন্যান্য শয়তানী বৃত্তি সংবৃত্তিসমূহকে চেপে মারবে। মানুষের ভিতর স্বরাস্বরের দ্বন্দ্ব তো চলছেই। এই কারণে পৃথিবীতে যে-দিন থেকে আর্থিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা সহযোগিতার আধার ছেড়ে প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল স্বতন্ত্র-ব্যক্তি-কেন্দ্রীক হয়েছে, সেদিন থেকে পৃথিবীতে

হিংসা, প্রতারণা, দ্বেষ ও ঘৃণা প্রভৃতি অপগুণের বিস্তার ঘটেছে। পরিণাম-স্বরূপ পূর্বে সাধারণ গৃহস্থের জন্য যে সকল সদ্‌গুণ অপরিহার্য ছিল, আজ তাকে মহাত্মার লক্ষণ আখ্যা দেওয়া হয়। এইরূপে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উৎকর্ষের পরিবর্তে জনসাধারণের ভীষণ নৈতিক পতন হচ্ছে।

চরখা স্বাবলম্বী উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দু

শিল্প-ব্যবসায়ের কেন্দ্রীকরণের জন্য কিভাবে যুদ্ধরূপী ঘোর হিংসা ও শ্রেণী-সংঘর্ষের সর্বনাশা পরিস্থিতি সৃষ্ট হয়, তা আমরা দেখেছি। আমরা এও দেখেছি যে, যন্ত্র ও শাসন-ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণের দ্বারা কিভাবে মানুষের ভিতর পারস্পরিক মানবতা-বন্ধন বিনষ্ট হয়ে যায় এবং মানব-সন্তান জড়-যন্ত্রের অংশস্বরূপ হয়ে পড়ে। সমগ্র সমাজ সজীব সমষ্টির পরিবর্তে একটি বিশাল জড়যন্ত্রের রূপ ধারণ করে নিয়েছে। মানুষের ভিতর অন্তর্নিহিত সদ্‌বৃত্তিসমূহ অনুকূল পরিস্থিতির অভাবে নষ্ট হতে চলেছে। সমাজে অসত্য, দ্বেষ এবং হিংসার অপ্রতিহত প্রতিপত্তি কায়েম হচ্ছে। এই মারাত্মক অবস্থার নিরাকরণ স্বাবলম্বী অর্থনীতি ও স্বাবলম্বী সমাজ-ব্যবস্থা দ্বারাই হতে পারে। এই কারণেই গান্ধীজী চরখাকে অহিংসার প্রতাক বিবেচনা করতেন। কারণ চরখা স্বাবলম্বী উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দু।

নঈ তালিম : ভাবী সমাজের কাঠামো

এখন প্রশ্ন হল এই যে, এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার উপায় কি? একটি স্থায়ী সমাজ-ব্যবস্থা রচনার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ কিছু তাৎকালিক কার্যক্রম রচনা করা যেতে পারে এবং জনসাধারণের উপর তার কিছু প্রভাবও পড়তে পারে। কিন্তু আমরা যে আদর্শ সমাজের কল্পনা করছি, তার উপযুক্ত নাগরিক সৃষ্টি করার জন্য

শিক্ষাপদ্ধতিতেই এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন করা আবশ্যক যার ফলে ভবিষ্যৎ নাগরিক বাল্যাবস্থা থেকেই সেই ধাঁচে গড়ে উঠে।

নঈ তালিম দ্বারা গান্ধীজী জনসাধারণকে সেই ধাঁচে গড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে জীবনের আবশ্যকতার পরিপূর্তি এবং সমাজ-ব্যবস্থা পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করার পরই বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে স্বাবলম্বী সমাজ রচনা করা সম্ভব। কেবল যোগ্যতা থাকলেই এইরূপ সমাজ স্থায়ী হতে পারে না। জনসাধারণের স্বভাব, সংস্কার এবং মানসিক প্রবৃত্তি স্বাবলম্বনাভিমুখী হওয়া প্রয়োজন।

নঈ তালিম ঃ স্বাবলম্বনের সক্রিয় শক্তি

এইজন্য নূতন শিক্ষা-পদ্ধতিতে অক্ষরকে শিক্ষার মাধ্যম না রেখে সামাজিক পরিবেশ এবং উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে এই স্থান দেওয়া হয়েছে। সামাজিক পরিবেশের অধ্যয়ন দ্বারা তাদের সমস্যা সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে ও সমস্যা সমাধানের পন্থা আবিষ্কারের অভ্যাস হয়। এই অভ্যাসের ফলে ভবিষ্যতের এইসব স্বতন্ত্র নাগরিকদের সমাজ-ব্যবস্থার দায়িত্ব অনুভব করা স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। জনসাধারণের মধ্যে এই প্রকার দায়িত্ব বহন করার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ও আত্মরক্ষার জন্য তাদের অন্য কোন বাহ্য শক্তির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। বাল্যাবস্থা থেকেই উৎপাদনের প্রক্রিয়াসমূহের সঞ্চালনে অভ্যস্ত থাকলে মানুষ সহজেই নিজ আবশ্যকতা পরিপূর্তির জন্য কেন্দ্রীয় যন্ত্রের ভরসা ছেড়ে দিতে পারে। কঠিন হলেও শৈশব থেকে এইসব উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান অর্জিত হবার কারণে উৎপাদন-পদ্ধতির জড়ভাব নষ্ট হয়ে যায় এবং জনসাধারণ তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে—এবং প্রতিনিয়ত তাদের প্রগতি হতে থাকে। এইভাবে নঈ তালিমের প্রক্রিয়া জনসাধারণের স্বাভাবিক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা ও যন্ত্রের

ভরসা ছাড়িয়ে তাদের ভিতর আত্মনির্ভরশীল বৃত্তি সৃষ্টি করে। এইজন্য নঈ তালিম স্বাবলম্বন সাধনার এক সক্রিয় শক্তি।

কেবল ভরসার কথাই নয়, মৌলিক আবশ্যকতা প্রাপ্তির বৈজ্ঞানিক উপায় নিজ করতলগত হবার জন্য আজ জনসাধারণের শ্রমের যে শোষণ হচ্ছে, তা বন্ধ হবে এবং তাদের অভাবজনিত উৎপীড়নও সমাপ্ত হবে।

নঈ তালিমের শিক্ষণ-কেন্দ্র স্বাবলম্বী হওয়া দরকার

গান্ধীজী একথাও বলেছেন যে, নঈ তালিমের বিদ্যালয়ের স্বাবলম্বী হওয়া অপরিহার্য। এর দ্বারা শিশুদের প্রকৃতি, সংস্কার এবং আচরণে স্বাবলম্বনের ধারণা অনুপ্রবিষ্ট হবে। শিক্ষাকেন্দ্রকে স্বাবলম্বী করার জন্য শিশুদের এবিষয়ে চিন্তা করতে হয় যে, কোন্ উপায় অবলম্বন করলে তাদের বিদ্যালয় স্বাবলম্বী হবে। এই প্রসঙ্গে তাদের একথাও চিন্তা করতে হয় যে, নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তারা কার কাছ থেকে সহায়তা নেবে? সহায়তার জন্য এই অনুসন্ধানই তাদের সামাজিক সহযোগের দিকে অনুপ্রাণিত করবে।

বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা এবং শিক্ষক

এই পদ্ধতি অনুসারে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা ছেলেদেরই করতে হয়। শিক্ষক কেবল পথপ্রদর্শক হিসাবে থাকেন। এইভাবে ছেলেরা যখন বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যবস্থা নিজেদের হাতে গ্রহণ করে, তখন বিদ্যালয়ই তাদের কাছে এক সমাজস্বরূপ হয়ে পড়ে এবং শিক্ষক এই পরিবেশকে সমাজ শাস্ত্রের জ্ঞান দেওয়ার এক সহজ মাধ্যম করে নেন। এই প্রকারে ছেলেদের আত্মবিশ্বাস এবং পরস্পরের প্রতি প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারের বিকাশ পায়। তারা সহযোগী এবং স্বাবলম্বী সমাজের উপযুক্ত নাগরিকতার অভিমুখে অগ্রসর হয়।

প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতি

প্রথমেই বলা হয়েছে যে মানুষকে যখন নিজের চেষ্টায় নিজ আবশ্যকতার পরিপূর্তি করতে হয়, তখন সহজেই তার সামাজিক প্রবৃত্তির বিকাশ হয়ে থাকে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে প্রাচীনকালেও স্বাবলম্বী উৎপাদন-পদ্ধতি ছিল; কিন্তু তাহলে লোকে পরাবলম্বী হল কি করে? প্রথম কারণ হল এই যে, সে সময় লোকে কেন্দ্রীকরণের অপকারিতার সঙ্গে পরিচিত ছিল না। এইজন্য তারা বিকেন্দ্রীকরণের বৈজ্ঞানিক আধারের উপর সমাজ-ব্যবস্থার স্বাবলম্বী পরিকল্পনা রচনা করেনি।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, উৎপাদনের প্রক্রিয়া শিক্ষার মাধ্যমে না হয়ে পৃথকভাবে যন্ত্রবৎ চলত এবং লোকে আলাদা বসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করত। এর ফলে উৎপাদন-কার্য বিজ্ঞান-রহিত হয়ে পড়ল এবং যুগের আবশ্যকতা অনুসারে প্রগতি হতে পারল না। অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব হয়ে পড়ল এবং তার স্তর নিম্নগামী হয়ে পড়ল।

নঈ তালিম : বৈজ্ঞানিক ও প্রগতিশীল সমাজ-রচনার এক সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা

এই মারাত্মক পরিস্থিতির নিরাকরণের জন্য গান্ধীজী বলেন যে স্বাবলম্বন এবং বিকেন্দ্রীকরণের আধারে অটল সামাজিক ভিত্তি রচনা করতে হলে উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে সজীব, বৈজ্ঞানিক এবং প্রগতিশীল করে তোলা অতীব প্রয়োজন। নঈ তালিমের পদ্ধতি এই অভীষ্টাভিমুখে এক সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা।

শ্রম থেকে বাঁচার প্রবৃত্তি

মানুষের লোভ কেন্দ্রীয় যন্ত্রবাদ ও উন্মত্ত শ্রম-শিল্পবাদের বিস্তার করেছে। কেবল ভোগ্য বস্তুর প্রাচুর্যের তৃষ্ণাই নয়, উপরন্তু মানুষের অন্য একটি প্রবৃত্তি

যন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধিকল্পে সহায়তা করেছে। এর নাম হল শ্রম থেকে বাঁচার প্রবৃত্তি। যন্ত্রের প্রয়োগ করে মানুষ দেখল যে অল্প পরিশ্রমেই অধিক উৎপাদন হয়ে যায়। এই প্রবৃত্তি মানুষের ভিতর এমন প্রবল তৃষ্ণা সৃষ্টি করেছে যে তারা নিজেদের সমস্ত বুদ্ধি এরই পিছনে নিয়োগ করা আরম্ভ করেছে।

পুঁজিবাদ ঃ প্রাচুর্যের লালসা এবং শ্রম না করার ইচ্ছা, এই দুইটি বিরোধী ইচ্ছার একত্রিত হওয়ার কুপরিণাম

বস্তুতপক্ষে শ্রম না করার প্রবৃত্তি অতি পুরান। ইতিহাসের উষাকালে পারস্পরিক হিংসার কারণে বিব্রত হয়ে মানুষ যখন কেন্দ্রীয় শাসনের সূত্রপাত করে, তখন থেকেই সমাজে বর্গ বা শ্রেণী-বৈষম্যের বীজ বপিত হয়। শাসক, ব্যবস্থাপক ও ব্যবসায়ীবর্গের জীবিকা স্বয়ং শ্রম না করে উৎপাদকবর্গের শ্রমের উপর নির্ভর করে চলতে লাগল। এইভাবে শ্রম করা অপেক্ষা বিনা শ্রমে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা অধিকতর মর্যাদাসূচক হয়ে পড়ায় শ্রমের হাত থেকে বাঁচা গৌরবজনক মনে করা হতে লাগল এবং সমাজে এইরূপ নিষ্কর্মা লোকেদের সম্মান বৃদ্ধি পেতে লাগল। শ্রমের মর্যাদা না থাকায় শ্রম এড়াবার প্রবৃত্তির বিকাশ হওয়া স্বাভাবিক। এইরূপে একদিকে প্রাচুর্য অর্থাৎ সচ্ছলভাবে থাকার লালসা আর অন্য দিকে শ্রমের হাত এড়াবার প্রবৃত্তি—এই দুই বিরোধী বিষয়ের সংমিশ্রণে যে শ্রম-শিল্পবাদের সৃষ্টি হয়, তা থেকেই পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশ হয় এবং অবশেষে শ্রেণী-বৈষম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল।

বাবুশ্রেণী

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক শ্রেণী ও পুঁজিপতি শ্রেণী ধীরে ধীরে এমন একটি শ্রেণীর আবশ্যকতা অনুভব করল, যারা উৎপাদনের প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত হয়ে শাসন এবং শ্রমশিল্প পরিচালনায় সহায়তা করতে পারে। এই

উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁরা এমন শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন করেন, যাতে শরীর-শ্রম না করতে হয়, কিন্তু সমাজে এইসব শ্রমকুণ্ঠ ব্যক্তিদের মর্যাদা বেড়ে যায় (একে রুগ্ন এবং পঙ্গুদের উপাসনাকরণ-পদ্ধতি বলা যেতে পারে)। এইরূপ লোকদের কেবল লেখা ও পড়ার যোগ্যতা থাকে এবং তাঁদের পক্ষে যান্ত্রিক ব্যবস্থার নগণ্য অঙ্গ হওয়া ছাড়া স্বতন্ত্র কোন কাজ করার ক্ষমতা থাকে না। এইরূপে সমাজে এক শিক্ষিত মধ্যমশ্রেণী অর্থাৎ বাবুশ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এই পুঁথিগত বিদ্যার প্রসার-হারের সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে এই শ্রেণীর সংখ্যা-বৃদ্ধি ঘটছে এবং আজ এত পরিমাণে এর সংখ্যাধিক্য হয়েছে যে পৃথিবীতে এই বাবুশ্রেণীর সমস্যা এক ভীষণ শ্রেণী-সমস্যার সৃষ্টি করে তুলেছে। সমস্যার নিষ্পত্তি ব্যতিরেকে পৃথিবীর অন্যান্য সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। নঈ তালিমের দ্বারা গান্ধীজী এ পথে এক সুনিশ্চিত এবং বৈপ্লবিক পদক্ষেপ করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

বস্তুতঃ সত্য এবং অহিংসার আধারে তখনই সমাজ টিকতে পারে, যখন জগতে কেউ কারও শোষণ করবে না, অর্থাৎ মানবসমাজে কেবল একটিমাত্র শ্রেণী থাকবে। কারণ এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে শোষণ করার ফলেই শ্রেণী-বৈষম্য প্রকট হয়। এই কারণে ভারতের শাস্ত্রকারেরা বলে গেছেন যে, সত্যযুগে একটিই শ্রেণী ছিল এবং পুনরায় পৃথিবীতে এক শ্রেণী না হওয়া পর্যন্ত সত্যযুগের পুনরাবির্ভাব অসম্ভব।

সমাজ যে হারে সত্য থেকে দূরে সরেছে, সেই হারে সামাজিক জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে সমাজে বিষমতা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যেরও অবলুপ্তি ঘটতে থাকে এবং অবশেষে পৃথিবী আজ এক ভয়ঙ্কর অবস্থায় উপনীত হয়েছে। অতএব সর্বপ্রথম এই মারাত্মক পরিস্থিতির নিরাকরণ করতে হবে। গান্ধীজী নঈ তালিমের দ্বারা এই কাজই করতে চেয়েছিলেন।

শ্রেণীহীন সমাজ

শ্রেণীহীন সমাজের অর্থ সমগ্র পৃথিবীতে একটি মাত্র শ্রেণীর অস্তিত্ব। এবার প্রশ্ন ওঠে যে এই একটি শ্রেণী কোন্ শ্রেণী হবে? দেখা যায় যে পৃথিবীতে মুখ্যতঃ তিনটি শ্রেণী আছে—(১) ধনী, (২) বাবু, (৩) শ্রমিক। সমাজকে শ্রেণীহীন করতে হলে এই তিনের ভিতর দুটিকে বিলুপ্ত করে একটিকে রাখতে হবে। তারপর প্রশ্ন ওঠে যে এদের ভিতর কাকে রেখে কাকে শেষ করতে হবে? এর উত্তর স্পষ্ট—যদি একটিমাত্র শ্রেণী রাখতে হয়, তবে সেই শ্রেণী এইরূপ হওয়া দরকার যে নিজের শক্তিতে টিকে থাকতে পারে। কোন শ্রেণী নিজের ভরসায় টিকে থাকার অর্থ হচ্ছে এই যে সেই শ্রেণী নিজ প্রচেষ্টায় নিজ আবশ্যকতা পূর্তি করতে পারে; অর্থাৎ জীবন-যাত্রার পক্ষে আবশ্যকীয় বস্তসমূহ তাদের স্বয়ং উৎপাদন করতে হবে। এক কথায় বলতে গেলে তাদের উৎপাদনমূলক শ্রম করতে হবে। এ ক্ষমতা একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীরই আছে। অভিজাত এবং বাবুশ্রেণীর অস্তিত্ব তো শ্রমিকশ্রেণীর শোষণের উপরই প্রতিষ্ঠিত। স্থতরাং শ্রেণী-হীন সমাজের অর্থ হচ্ছে সমাজে কেবল তারাই থাকবে যারা নিজেদের শ্রমের দ্বারা উৎপাদন করতে পারবে। এর সরল অর্থ হল এই যে, যারা শোষণের উপর বেঁচে আছে, তাদের বিলুপ্ত করে দেওয়া দরকার।

পাশ্চাত্য দেশেও এইরূপ শ্রমিকদের শ্রেণীহীন সমাজের কল্পনা করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে উপনীত হতে তাঁরা যথেষ্ট চেষ্টাও করেছেন। শ্রমিকদের দ্বারা হিংসাত্মক উপায়ে ধনী ও বাবুদের নিঃশেষ করার পথে এই চেষ্টা চালিত হয়েছিল। কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন যে এই দুটি শ্রেণীকে ধ্বংস করে দিলে সমাজে কেবল তৃতীয় শ্রেণীটি অবশিষ্ট রয়ে যাবে। কিন্তু এই জাতীয় হিংসাত্মক শ্রেণী-সংঘর্ষের পরিণাম কি হবে? এ তো সর্বজন-বিদিত যে হিংসা থেকে প্রতিহিংসার সৃষ্টি হয়। হিংসা এবং প্রতিহিংসার ঘাত-প্রতিঘাতে মানবসমাজ সদাই ছিন্নভিন্ন হয় এবং সমাজ তার অভীষ্ট

সুখ-শান্তির লক্ষ্যে কখনও উপনীত হতে পারে না। সুখ-শান্তিকে জলাঞ্জলি দিলেও এপথে কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধ হয়? হিংসাত্মক উপায়ে কি শোষক-শ্রেণীর বিনাশ সম্ভব? যাঁরা হিংসাত্মক উপায়ে শোষকশ্রেণীর বিনাশের পরামর্শ দিয়ে থাকেন, তাঁরা নিজেদের মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির আকর মনে করেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে বিজ্ঞানের প্রথম নিয়ম এই যে "পৃথিবীতে কোন পদার্থের বিলুপ্তি অসম্ভব।" বস্তুর কেবল রূপ-পরিবর্তনই সম্ভব। বৈজ্ঞানিক ইউরোপে উপরোক্ত শ্রেণীদ্বয়কে বিলুপ্ত করার চেষ্টা করার সময় বিজ্ঞানের এই মৌলিক নিয়মের উপেক্ষা করায় এর পরিণামে এই সকল শ্রেণীর বিনাশ না হয়ে রূপান্তর হয়েছে। তারা পুঁজিপতির পরিবর্তে ব্যবস্থাপক শ্রেণীর নামে নিজের স্থানে পূর্ববৎ সুরক্ষিত রয়েছে এবং এই পরিবর্তন হিংসাত্মক উপায়ে হয়েছে বলে স্বভাবতঃ এ থেকে প্রতিহিংসা সৃষ্টি হয়েছে।

নঈ তালিম : সমাজকে উৎপাদকশ্রেণীর রূপ দিয়ে থাকে

প্রত্যেক ক্রিয়ার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হয়। এই নবজাত ব্যবস্থাপক শ্রেণী সমাজকে বুদ্ধি এবং শাসনযন্ত্রের দ্বারা এমন শক্ত করে চেপে রেখেছে, যা ইতঃপূর্বে তারা তাদের ধনী ও বাবুস্বরূপে কখনও চিন্তা করতে পারত না। অতএব উৎপাদকদের একটিমাত্র শ্রেণী রাখা যদি সমাজের কাম্য হয়, তবে তাকে এমন ব্যবস্থা আবিষ্কার করতে হবে, যাতে শেষ দুই শ্রেণীর বিলোপ হয়ে সমগ্র সমাজ প্রত্যক্ষভাবে স্বয়ং উৎপাদকশ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। গান্ধীজী নঈ তালিমের দ্বারা সমাজকে এই রাস্তায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। উৎপাদকের দ্বারা হিংসাত্মক উপায়ে অভিজাত ও বাবু-সম্প্রদায়ের বিনাশ করা তাঁর কাম্য ছিল না। বরং তাদের উৎপাদক-শ্রেণীতে বিলীন করে দেবার অহিংস প্রক্রিয়াই ছিল তাঁর পন্থা। হিংসাত্মক

প্রক্রিয়ায় কেউ কারও সঙ্গে মিলিত করতে পারে না। কারণ মিলন তো প্রেম এবং সহযোগের পক্ষেই সম্ভব।

হিংসা নিরাশার নিদর্শন

হিংসার দ্বারা পৃথিবীতে বিপ্লব হতে পারে না। বস্তুতঃ হিংসা এবং বিপ্লব এরা পরস্পরবিরোধী কথা। বিপ্লবের অর্থ আমূল পরিবর্তন। যে ব্যক্তি পরিবর্তনে বিশ্বাসী, সে কখনও হিংসা করতে পারে না। কারণ হিংসা স্রেফ নিরাশার নিদর্শন। যার ভিতর এ বিশ্বাস অবশিষ্ট থাকে না, যে মানুষের ভিতর পরিবর্তন হওয়া সম্ভব, সেই ধ্বংসের কথা চিন্তা করে। অতএব হিংসা এক নিরাশাবাদী মনোভাব এবং নিরাশাবাদী বৃত্তি দ্বারা বিপ্লবের সফলতা আশা করার অর্থ আত্মপ্রবঞ্চনা করা। সুতরাং সমাজে যদি প্রকৃত এবং আমূল বিপ্লব সাধন করতে হয়, তবে শ্রেণী-সংঘর্ষের হিংসাত্মক এবং ব্যর্থ চেষ্টা না করে শ্রেণী-পরিবর্তনের অহিংসাত্মক উপায়ে নিশ্চিত বিপ্লবের দিকে পদক্ষেপ করতে হবে।

অহিংসাত্মক পথ ঃ প্রকৃত এবং সম্পূর্ণ বিপ্লবের একমাত্র মার্গ

তর্কের খাতিরে আমরা যদি কিছু সময়ের জন্য পূর্বোক্ত পন্থা বর্জন করি তবুও আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে হিংসাত্মক উপায়ে কোন সমস্যার বাস্তব সমাধান হতে পারে না। এই যুগে তো হিংসার দ্বারা সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করলে মানবসমাজেরই অবসান হয়ে যাবে। অতীত-কালে যখন আজকের মত বিজ্ঞানের এত "বিকাশ" হয়নি, সে সময় হিংসাত্মক উপায়ে সমস্যার সমাধান করলেও সমাজের বাঁচার একটা উপায় ছিল। পাথর, লাঠি, তীর-ধনুক, তলোয়ার এবং বন্দুক দ্বারা মানুষ শত চেষ্টা করলেও ধ্বংসের পরিণাম একটা সীমার ভিতর থাকত। কিন্তু আজ পরমাণবিক এবং মহা জাগতিক যুগে হিংসার প্রয়োগ করলে তার পরিণাম কি হবে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। এইভাবে আজকার

বৈজ্ঞানিক যুগে হিংসার প্রত্যেকটা পরিকল্পনা নিতান্ত অব্যবহারিক হওয়ায় সে সম্বন্ধে চিন্তা করাও অপ্রয়োজনীয়। অতএব প্রকৃত এবং সম্পূর্ণ বিপ্লবের জন্য গান্ধীজীর অহিংসাত্মক মার্গ ব্যতিরেকে অপর কোন নির্ভর-যোগ্য পন্থা নাই।

আত্মশুদ্ধি

উপরে বলা হয়েছে যে গান্ধীজীর বিপ্লব-পদ্ধতি হল ধনী এবং বাবু-শ্রেণীকে সংশোধন করে উৎপাদকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা। এই কারণে তিনি তাঁর সমস্ত আন্দোলনকে আত্মশুদ্ধির আন্দোলন বলেছিলেন। এর জন্য প্রথমে তিনি নৈতিক উপায়ে শোষকশ্রেণীর বিবেক জাগ্রত করণার্থ বলেন, "শোষকের রূপ পরিহার করে তুমি স্বেচ্ছায় উৎপাদকশ্রেণীতে বিলীন হয়ে যাও এবং তাদের সঙ্গে উৎপাদনকার্যে আত্মনিয়োগ কর।" তিনি তাঁর সমস্ত গঠনমূলক কাজকে এই উদ্দেশ্যে নিয়োগ করেন। অভিজাত শ্রেণীর নবযুবকদের গ্রামীণ হয়ে শ্রম দ্বারা উপার্জন করে সমগ্র গ্রামসেবার কার্যক্রম রচনা করতে বলা, খাদি পরার জন্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রের আট ভাগের এক ভাগ সূতা কাটার নিয়ম করা, বোম্বাই-এর মত শহরের অধিবাসীদের জমি না পাওয়া গেলেও মাটির টবে নিজের হাতে শস্য উৎপাদন করে অন্ন সংগ্রহ করার অধিকার অর্জন করার পরামর্শ দেওয়া, বিদ্যালয়ে উৎপাদনমূলক শরীর-শ্রমকেই প্রথম স্থান দেওয়া ইত্যাদি সবই গান্ধীজী কর্তৃক প্রত্যেক মানুষকে কোন না কোন উপায়ে উৎপাদনকার্যে প্রবৃত্ত করে তাদের শ্রমিকবর্গে মিলিত করে দেওয়ার প্রচেষ্টা ছিল।

একথা ঠিক যে, গান্ধীজীর যাবতীয় কাজ শ্রেণীহীন সমাজ-রচনার পূর্ব-প্রস্তুতি ছিল; তবে নঈ তালিম দ্বারা পৃথিবীতে কেবল উৎপাদকদেরই এক শ্রেণীহীন সমাজ রচনা-পদ্ধতি তাঁর অন্তিম কিন্তু অত্যন্ত ব্যাপক এবং সুপরিকল্পিত চেষ্টা ছিল।

"নঈ তালিমের" ভিত্তি

এই শিক্ষা-পদ্ধতিতে উৎপাদনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞান হয়। অর্থাৎ গান্ধীজী শরীর-শ্রম দ্বারা উৎপাদন-কার্যকেই শিক্ষার মাধ্যম করেছেন। এই পদ্ধতিতে নিজ মৌলিক আবশ্যকতার পরিপূর্তির জন্য শ্রম করতে করতে মানুষের যাবতীয় বৌদ্ধিক শিক্ষা পূর্ণ হয়। এইজন্য এর নাম "বুনিয়াদী শিক্ষা" রাখা হয়েছে। কারণ, এই পদ্ধতিতে জীবনের মৌলিক আবশ্যকতার পরিপূর্তি করার চেষ্টায় মানুষ তার স্বাভাবিক কার্যের সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যক জ্ঞান অর্জন করে।

পুরাতন শিক্ষা : শ্রেণী-পরিবর্তন হয় কিন্তু উল্টাভাবে

এর অর্থ এই যে, সমাজে শিক্ষিত বলা হয় তাকেই, যার ভিতর উৎপাদন-ক্রিয়ার যোগ্যতা আছে অর্থাৎ যে স্বয়ং উৎপাদক। পুরান শিক্ষায় গৃহ-কোণে বসে বই মুখস্থ করার প্রক্রিয়া ছিল এবং এর পরিণামে শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাবার জন্য তাদেরকে উৎপাদনকার্য থেকে মুক্ত করে দিতে হত; অর্থাৎ উৎপাদকশ্রেণীর শিশুরা নিজ শ্রেণী ছেড়ে বাবুশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। এই হিসাবে পুরান শিক্ষাও শ্রেণী-পরিবর্তনেরই পদ্ধতি ছিল; কিন্তু এ পরিবর্তন বিপরীত দিকে। ফলে পুরাতন শিক্ষার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বাবুদের সংখ্যা বাড়তে আরম্ভ করে এবং উৎপাদকদের স্কন্ধের উপর শোষকদের ভার পড়তে লাগল। এইজন্য পৃথিবীতে আজ শ্রেণী-বিষমতা এত জটিল আকার ধারণ করেছে। যদি এই গতিতে সব কিছু চলতে থাকে, অতি সত্বর পৃথিবীতে শোষকের সংখ্যা এত বেড়ে যাবে যে, তাদের ভারে উৎপাদক-সম্প্রদায় চাপা পড়ে মরে যাবে; এবং উৎপাদক-সম্প্রদায় মরে গেলে বাবু-সম্প্রদায়ও শুকিয়ে মরে যাবে।

নঈ তালিমে বাবুদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে উৎপাদকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কারণ এই শিক্ষা-পদ্ধতি লাঙ্গল কোদাল, চরখা ও হাতুড়ির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার

জন্য প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি সহজেই পরিবর্তিত হয় এবং উৎপাদনের কাজ করতে করতেই প্রত্যেক উৎপাদক শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায়। এই ভাবে যখন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর প্রত্যেক ব্যক্তিকে উৎপাদক হতে হয় এবং প্রত্যেক উৎপাদক যখন বৌদ্ধিক বিকাশের সম্পূর্ণ সুযোগ পায় তখন সমাজে শ্রেণীবিভেদ আপনা-আপনি সমাপ্ত হয়ে যায়। এই পদ্ধতিতে হিংসাত্মক সংঘর্ষের অশান্তিকর চোরাবালিতে আটকা পড়ার আবশ্যকতা থাকে না।

শ্রম বনাম শ্রেণী-বিভাজন (জন্মজাত না কর্মজাত)

আজকাল যাঁরা শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলেন, তাঁরা স্বয়ং শুদ্ধ বুদ্ধিজীবী শ্রেণীরই জীব। কিন্তু নিজেদের তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর সদস্যরূপে এক করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন। তাঁদের বক্তব্য এই যে, সকলের পক্ষে স্বয়ং প্রত্যেকটি কাজ করা সম্ভব নয় এবং সমাজে শ্রম-বিভাজনের আবশ্যকতা তো আছেই। অতএব যাঁরা বই লিখেন, বক্তৃতা অথবা এইরূপ কোন বৌদ্ধিক শ্রম করেন, তাঁদের আবার শরীর-শ্রমের উপর জোর দিতে বলা কেন? তাঁদের যুক্তিতে এ সবই উৎপাদনের কার্য। এইজন্য তাঁরা বলেন যে, কেউ বৌদ্ধিক শ্রম ও কেউ শরীর-শ্রম করুক। একে তাঁরা শ্রেণী-বিভাজন না বলে শ্রম-বিভাজন বলেন। তাঁদের মতে যাঁরা বৌদ্ধিক শ্রমে রত, তাঁদের আবার শরীর-শ্রমে আটকিয়ে সময় এবং শক্তির অপব্যয় করা কেন? তাঁরা বলেন যে যাঁরা বৌদ্ধিক শ্রম করার উপযুক্ত তাঁরা বৌদ্ধিক শ্রম করুন ও যাঁরা শরীর-শ্রম করার উপযুক্ত তাঁরা শরীর-শ্রম করুন। তাঁদের মতে এই করলেই সমাজ শ্রেণীহীন হয়ে যাবে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এঁরাই আবার ভারতের প্রাচীন বর্ণভেদ-প্রথার ঘোরতম বিরোধী। এঁরা বলেন যে বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা অতীব প্রতিক্রিয়াশীল প্রথা। এতদ্দ্বারা সমাজের প্রগতি রুদ্ধ হয়। তাঁরা সমাজকে ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত করার ঘোর বিরোধী। অথচ এদিকে তাঁদের মতে যাঁরা বৌদ্ধিক

শ্রম করেন তাঁদের শরীর-শ্রম করার কোন আবশ্যকতা নাই এবং তাঁদের ব্যক্তিগত আরাম ও অন্যান্য কাজের জন্য উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করা দরকার। এ ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের নবীন রূপ ছাড়া আর কি? পার্থক্য কেবল এইটুকু যে এই সব আধুনিক শাস্ত্রজ্ঞরা বর্ণ-ব্যবস্থাকে জন্মগত না মনে করে কর্মগত বিবেচনা করেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে শ্রমিকদের যদি বৌদ্ধিক এবং শারীরিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করতেই হয়, তাহলে সমাজের প্রগতির জন্য জন্মগত শ্রেণী-ব্যবস্থা অধিকতর বৈজ্ঞানিক হবে। কারণ সমাজ এতে পূর্ণরূপে পৈতৃক সংস্কারের সুফল দ্বারা লাভবান হবে। অবশ্য এক-আধজন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই নিয়ম অন্যায় মনে হতে পারে; কিন্তু সমাজের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা এক-আধজন ব্যতিক্রমের কথা হিসাব না করে সমস্ত সমাজের কল্যাণের দিকে চেয়েই হয়ে থাকে।

বস্তুতঃ পক্ষে বৌদ্ধিক এবং শারীরিক শ্রমকারীদের একই শ্রেণীতে রাখা যেতে পারে বলে ভাবা ভুল। কারণ প্রত্যেকেই জানে যে এই দুই প্রকার শ্রমের ভিতর একটি রুচিকর, অপরটি অরুচিকর এবং রুচিকর শ্রমই শ্রেষ্ঠ। অতএব সকলেই রুচিকর শ্রম করার সুযোগ পেতে চাইবে। সুতরাং সমাজের যদি অরুচিকর শ্রমের প্রয়োজন হয়, তবে পরিস্থিতির চাপ দিয়ে এই কাজ আদায় করতে হবে। কারণ স্বেচ্ছায় এই কাজ কেউ করতে চাইবে না। আজ পয়সার লোভ অথবা পরিস্থিতির চাপে পড়েও উচ্চ বর্ণের লোকেরা মেথরের কাজ করতে প্রস্তুত নয়। সেইজন্য সমাজে যদি ন্যায়বিচার এবং স্বাধীনতার ভিতরে শ্রমিকদের একটিমাত্র শ্রেণী স্থাপনা করতে হয়, তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৌদ্ধিক এবং শারীরিক উভয় প্রকারের কাজই করতে হবে।

ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রের দুইটি শ্রেণীবিশিষ্ট সমাজ যদি রাখতেই হয়, তবে সমাজের প্রগতির জন্য মানব-উদ্বর্তনের এক মূল সিদ্ধান্ত দ্বারা কেন আমরা লাভবান হব না? এর নাম হল "সন্তানের পৈতৃক স্বভাব-প্রাপ্তি" অথবা সংস্কারের সিদ্ধান্ত। শিক্ষিত পরিবারের পাঁচ বছরের ছেলে স্কুলে যেয়ে বরাবরই কৃষক

ও শ্রমিকের ছেলেদের তুলনায় লেখাপড়ায় অনেকখানি অগ্রসর থাকে এবং ঐ বয়সের কৃষক ও মজুরের ছেলে মাটি খোঁড়ার বা বোঝা বইবার ব্যাপারে শিক্ষিত পরিবারের ছেলের চেয়ে অনেক পটু হয়। এর মূলে রয়েছে উভয়ের ভিতর পৈতৃক সংস্কারের ভিন্নতা। সেইজন্য সমাজকে যদি বৌদ্ধিক এবং শারীরিক শ্রমিকরূপে বিভক্ত করতে হয় তবে এ বিভাগ জন্মগত হলেই মঙ্গল। বংশানুক্রমিকতা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের অনুকূল। সেইজন্য যাঁরা জাতিভেদের বিরোধী তাঁদের শ্রমের শ্রেণীবিভাগেরও বিরোধী হতে হবে। কারণ যদি শ্রমের শ্রেণীভেদ রাখতেই হয়, তাহলে বংশানুক্রমিক বিভাগের পরিবর্তে বিভেদের আধার "কর্ম"-ভিত্তিক করলে সমাজ কুশলতা ও যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত হবে।

শ্রেণীহীন সমাজের শ্রম-বিভাজন

প্রশ্ন উঠতে পারে যে শ্রম-বিভাজন ছাড়া সমাজের উৎপাদন-কার্য কি করে চলবে? প্রত্যেক ব্যক্তি একাই সব কাজ করতে পারে না, এ কথা ঠিক। সুতরাং শ্রম-বিভাজনের কোন আধার থাকা একান্ত প্রয়োজন। প্রকৃত শ্রেণীহীন সমাজে এই আধার গুণ-সম্বন্ধীয় না হয়ে বস্তু-সম্বন্ধীয় হবে, অর্থাৎ কেউ কোন এক বস্তু উৎপাদন করবে এবং অপর একজন অন্য কোন বস্তু উৎপাদন করবে। কিন্তু উৎপাদন-কার্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে শারীরিক এবং বৌদ্ধিক দুই প্রকারের শ্রমই করতে হবে। শ্রম-বিভাজনের নামে কেউ খাবার এবং কেউ রাঁধবার শ্রম করার যে প্রথা চলে আসছে, গান্ধীজীর পরিকল্পিত শ্রেণীহীন সমাজে তার কোন স্থান নেই। তাঁর কল্পনানুযায়ী শ্রেণীহীন সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৌদ্ধিক এবং শারীরিক উভয় প্রকারের শ্রমই করতে হবে। নতুবা শ্রেণীহীন সমাজের এই সিদ্ধান্ত কেবল ফাঁকা কথা হয়েই থেকে যাবে। এইজন্য শ্রেণীহীন সমাজ রচনার পথে গান্ধীজীর নঈ তালিমের পদ্ধতি অন্যান্য সকল পদ্ধতি অপেক্ষা অধিক কর্মকুশল, বৈজ্ঞানিক এবং বাস্তব।

(৭)

সমান সুযোগের প্রকৃত অর্থ

আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায় সমান অধিকার দানের কথা বলে থাকেন। তাঁরা বলেন যে শিক্ষার জন্য সকলকে সমান সুযোগ দেওয়া উচিত। শিক্ষা-পদ্ধতির ভিতর যদি উৎপাদনের কোন স্থান না থাকে তবে সকলকে শিক্ষা লাভের সুযোগদানের অর্থ এই হয় যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে উৎপাদনের ক্রিয়া ছেড়ে দেবার সুযোগ দান করা। এর অর্থ এই হয় যে প্রত্যেক ব্যক্তি শিক্ষাকাল সমাপ্তির পরই উৎপাদনের কার্য আরম্ভ করবে। তারপর শিক্ষা সমাপ্ত হলে প্রত্যেককে নিজ অভিরুচি অনুসারে রুচিকর কিংবা অরুচিকর শ্রম বেছে নেওয়ার সমান সুযোগ দিতে হবে। মানুষ তখন কোন্ দিকে ঝুঁকবে, তা সকলেই অনুমান করতে পারেন। প্রত্যেকেই যদি নিজ শিক্ষানুসারে রুচিকর শ্রম করতে চায়, তাহলে সমাজ কি তার সমুচিত ব্যবস্থা করতে পারবে? এইভাবে উৎপাদনকার্য সমাপ্ত হয়ে গেলে সমাজ কি করে চলবে? কথা উঠতে পারে যে আমি এই বিষয়টিকে নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি করছি। সমান অধিকারের অর্থ এই নয় যে অযথা সকলেই অধিকার প্রয়োগ করে শিক্ষাক্রমকে সম্পূর্ণ করবেই। এমন অনেকে থাকবেন, যাঁরা পড়াশুনা করবেনই না, বা কিছুদিন পর পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে লাঙ্গল চালাতে আরম্ভ করবেন। এ রকম হতে পারে। কিন্তু এর কারণ এই নয় যে অধিকাংশ লোকের রুচি পড়বার দিকে নেই এবং তাদের লেখাপড়া না করার কারণ পরিস্থিতির অনিবার্যতা এবং পরিস্থিতির অনিবার্যতার জন্য যদি কেউ পড়তে না যায়, তবে সেখানে সমান সুযোগের আদর্শ আর কোথায় থাকে? অতএব সকলকে যদি সমান সুযোগ দিতে হয় তবে এমন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার বর্তমান পরিস্থিতির ভিতর থেকেও শিক্ষালাভের সুযোগ পায়।

আজকাল প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে আর একটি কথা শোনা যায়। তাঁরা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হলে তার মান অন্ততঃ এতখানি হওয়া উচিত যে বাধ্যতামূলক শিক্ষাকাল সমাপনান্তে ছাত্র যেন নিজের শিক্ষিত অবস্থা বজায় রাখতে পারে। পনর বৎসর বয়স পর্যন্ত বিদ্যালয়ের ঘরের ভিতর বসে পুঁথিপত্র পড়ার পর যখন তাকে লাঙ্গল ধরতে হবে, তখন তার কি দশা হবে তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। শৈশব থেকে মৌলিক উৎপাদনের প্রক্রিয়ার অভ্যাস না হলে সে কার্যে নিপুণতা এবং তৎপরতা কিছুই আসতে পারে না। সুতরাং, একথা স্পষ্ট যে পুরাতন পদ্ধতিতে পনর বৎসর বয়স পর্যন্ত স্কুলে পড়ার পর সকলে উৎপাদন-কার্যে আত্মনিয়োগ করলে মানুষের আবশ্যকতার পরিপূর্তি হওয়া অসম্ভব।

বিকেন্দ্রিত সমাজে উৎপাদন করার অভ্যাস শৈশব থেকেই হওয়া দরকার

অন্যান্য যেসব শিল্প-সমৃদ্ধ দেশে যন্ত্র দ্বারা উৎপাদন হয়, সেখানে যন্ত্র-চালককে হস্ত, চক্ষু এবং মস্তিষ্ক সহযোগে উৎপাদন-কার্য করতে হয় না। সেখানে যন্ত্রচালকও যন্ত্রের অঙ্গ হিসাবে, যন্ত্রকে চালায়। সুতরাং সেখানে ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস করার কোন কথাই ওঠে না। সেইজন্য সেখানে এই প্রকার পড়াশুনার পর যন্ত্র চালান সম্ভব হয়। কিন্তু গান্ধীজীর বিকেন্দ্রিত এবং স্বাবলম্বী সমাজে উৎপাদনকার্যের জন্য শৈশব থেকেই উৎপাদনের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার অভ্যাস হওয়া একান্ত অপরিহার্য। আর তখনই এ সম্ভব, যখন সেই সব প্রক্রিয়াকে শিক্ষার মাধ্যম করে দেওয়া হবে।

গান্ধীজীর নঈ তালিম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি

বিশ্বের যাবতীয় উৎপাদনকার্য সুচারুরূপে পরিচালিত করে এক শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে উৎপাদন-ক্রিয়ার সঙ্গে

সঙ্গে বৌদ্ধিক বিকাশ করতে পারে তার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। নতুবা জনকল্যাণের যাবতীয় আদর্শ ভোট সংগ্রহ করার রাজনৈতিক বুলি হয়েই থেকে যাবে। সেগুলিকে কার্যে পরিণত অথবা বাস্তবক্ষেত্রে মূর্ত করা সম্ভব হবে না। অতএব পৃথিবীতে শাসনহীন এবং শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপন করা যদি আমাদের লক্ষ্য হয় এবং আমরা যদি মানবসমাজকে হিংসা এবং শোষণ থেকে মুক্ত করে পূর্ণমাত্রায় স্বাধীন করতে চাই, তাহলে বাপু (গান্ধীজী) কথিত 'নঈ তালিম' ছাড়া শিক্ষার অন্য কোন বাস্তব এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আজ পর্যন্ত কেউ দেখাতে পারেন নি।

পরিশিষ্ট—১

এক ঘণ্টার পাঠশালা

[বিনোবাজীর সহিত প্রশ্নোত্তর]

১। **প্রশ্ন**ঃ—আপনি বলেছেন যে প্রতিদিন এক ঘণ্টার পাঠশালা গ্রামের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ছেলেদের পূর্ণ জ্ঞান দেওয়া সম্ভব হবে কি? যেমন শারীরিক দৃষ্টিতে গ্রাম্য লোকেরা অর্ধাহারে (under-fed) আছে, তেমনি এক ঘণ্টার পড়ানতে কি তারা মানসিক দৃষ্টিতে অর্ধাহারে থাকবে না?

বিনোবাঃ—প্রতিদিন এক ঘণ্টার বৌদ্ধিক ক্লাস ছেলেদের পক্ষে যথেষ্ট। শিক্ষক নিজে গ্রামের অন্য লোকের মত হস্তকর্ম দ্বারা নিজের ভরণপোষণ করবেন; এবং বাকী সময়েও তাঁর এবং গ্রামের লোকদের মধ্যে সজীব সম্পর্ক থাকবে এবং ছাত্ররা তা থেকে কিছু না কিছু শিখতে থাকবে। কিন্তু এ বিষয়টি ছেড়ে দিলেও নিয়মিতভাবে এক ঘণ্টার পড়াশুনা ছেলেদের পক্ষে যথেষ্ট। আমি ত একটি সিদ্ধান্তই করে নিয়েছি যে, যতটা সময় খাদ্য গ্রহণের জন্য অর্থাৎ শরীরের নিকট খাদ্যপ্রেরণের জন্য প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণ সময় জ্ঞানার্জনের জন্য, অর্থাৎ বুদ্ধি ও মনকে খাদ্য জোগাবার পক্ষে যথেষ্ট। অবশিষ্ট সময়ও খাদ্যবস্তু পরিপাকের জন্য প্রয়োজন। সমস্ত দিনে যদি আমি তিনবার খাদ্যগ্রহণ করি তবুও খাওয়ার জন্য সর্বসমেত দেড় ঘণ্টার অতিরিক্ত লাগে না। সুতরাং বুদ্ধির খোরাক জোগাতেও এর থেকে অধিক সময় লাগা উচিত নয়। এক ঘণ্টা যদি ঠিকমত পড়ান যায় তবে ঐ সময়ের মধ্যে ছেলেদের এত জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে, যা হজম করার জন্য মনন ও অনুশীলনের জন্য তাদের প্রচুর সময়ের প্রয়োজন। আমাদের একথা বুঝে নেওয়া দরকার যে শিক্ষার অর্থ জ্ঞান দান করা নয়। এ কথা প্রায়ই আজকাল মনে করা হয়ে থাকে।

শিক্ষার অর্থ ছেলেদের মধ্যে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা জাগ্রত করা। এইটুকু হয়ে গেলে, অর্থাৎ জ্ঞান-পিপাসা জাগ্রত হবার পর বাকী কাজ সহজ হয়ে যায় এবং তা ছাত্ররা স্বয়ং করে নেবে। অতএব এক ঘণ্টা সময় এর জন্য যথেষ্ট মনে করা দরকার।

আবার আমাদের এ বিষয়েও মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক যে আজকাল যে সব স্কুল পাঁচ ঘণ্টা চলে, তাতে বৎসরে পাঁচ মাস ছুটি থাকে। সুতরাং পাঁচকে আড়াই ঘণ্টাই মানা দরকার। আবার মাঝে মাঝে ছুটি হয়ে যাওয়ার দরুণ ছেলেদের কোন বিষয়ের মর্ম গ্রহণ করতেও সময় লাগে। আর আমাদের পাঠশালা ত রোজ একঘণ্টা চলবে। এই সব পাঠশালার শিক্ষক বর্তমান প্রাইমারী পাঠশালার অধ্যাপকদের অপেক্ষা অধিক যোগ্যতা-সম্পন্ন হবেন। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ত উল্টা পথে চলছে। প্রাইমারী স্কুলে, যেখানে সর্বাপেক্ষা উত্তম শিক্ষকের প্রয়োজন, সেখানে সর্বাপেক্ষা অযোগ্য শিক্ষককে নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং সব মিলিয়ে আমাদের এক ঘণ্টার শিক্ষা কম হবে না।

২। **প্রশ্ন** :—আপনি যে কথা বললেন, সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে তা ঠিক ; কিন্তু এক ঘণ্টার শিক্ষা কি উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতির পক্ষেও যথেষ্ট হবে ?

বিনোবা :—আমি ত ছোট ছেলেদেরকে সোজা উপনিষদই শিখিয়েছি। এই প্রকারে রোজ এক ঘণ্টা পড়ানতে সর্বোচ্চ শিক্ষাও দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমি এক ঘণ্টার পাঠশালার যে কল্পনা করেছি তা কেবল বুনিয়াদী বা প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই। তার তুলনা বর্তমানের চার পাঁচ ঘণ্টার প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গেই করা যেতে পারে। আমাদের দেখতে হবে যে, ছেলেদের যতটা প্রস্তুতি বর্তমান শিক্ষার দ্বারা হয়ে থাকে, ততটা আমার এক ঘণ্টার পাঠশালায় হয় কিনা ? এর অতিরিক্ত আমি ত বলছি যে গ্রামে গ্রামে 'ইউনিভার্সিটি' হওয়া প্রয়োজন। এক ঘণ্টার পাঠশালা সাধারণ ও ব্যাপক শিক্ষার জন্য। কিন্তু গ্রামের জন্য এইটুকুতেই আমি

সন্তুষ্ট হব না। যদি প্রত্যেক গ্রামে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত লোক বাস করে এবং সমস্ত কাজ হয়, তবে প্রত্যেক গ্রামে পরিপূর্ণ শিক্ষার ব্যবস্থাও হওয়া দরকার। সাধারণ শিক্ষা গ্রামে, তদপেক্ষা উচ্চ জেলাতে, তদপেক্ষা উচ্চ বড় শহরে, তদপেক্ষাও উচ্চ অন্য কোন স্থানে; এরূপ পরিকল্পনা ভুল। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কাজ যখন গ্রামে গ্রামে চলে থাকে, তখন সর্বপ্রকার শিক্ষার সাধনও সেখানে মজুত আছে। এইজন্য আমি বলি এবং আমি মনে করি যে গ্রামে গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের মত উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে এবং তা হওয়া চাই।

৩। **প্রশ্ন**ঃ—আপনার কথা অনুসারে উচ্চাতিউচ্চ তত্ত্বজ্ঞান অথবা সমাজ-শাস্ত্রের জ্ঞানের জন্য ত প্রত্যেক গ্রামে ব্যবস্থা হতে পারে; কিন্তু যাকে আমরা বিজ্ঞান বলছি, তার, অর্থাৎ উচ্চ টেকনিকাল শিক্ষা তথা গবেষণার ব্যবস্থা প্রতি গ্রামে কিরূপে সম্ভব হবে? প্রতি গ্রামে এর জন্য প্রয়োজনীয় সাধন কোথা থেকে আসবে?

বিনোবাঃ—প্রত্যেক গ্রামে 'ইউনিভার্সিটি' হওয়া চাই এ কথার অর্থ এরূপ নয় যে প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেকটি বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করার ব্যবস্থা থাকবে। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কি এরূপ করা সম্ভব হয়েছে? প্রত্যেক ইউনিভার্সিটিতে, ফ্যাকালটি অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার এবং গবেষণা করার ব্যবস্থা ত থাকে না। দুই স্থানে একই বিষয়ের সমান ব্যবস্থা থাকলেও ছাত্ররা সেই স্থানে বেশী যায় যেখানে সেই বিষয়ের ভাল অধ্যাপক থাকেন। গ্রাম্য বিশ্ববিদ্যালয়েরও তেমনি হবে। সাধারণতঃ, উচ্চাতিউচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা প্রত্যেক জায়গায় থাকবে। কিন্তু যেখানে অধিক জঙ্গল আছে সেখানে 'বনশাস্ত্র' অথবা 'দারুশাস্ত্র' অথবা ঔষধি-বিজ্ঞানের ফ্যাকালটি থাকবে, যা সব জায়গায় হওয়া সম্ভব নয়। এ কথাও বোঝা দরকার যে, সকল উচ্চ জ্ঞান ভৌতিক সাধনের উপর নির্ভর করে না। উদাহরণস্বরূপ জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞানের জন্য প্রত্যহ দূরবীণ

দিয়ে দেখার আবশ্যকতা করে না। দূরবীণ দিয়ে কখনও কখনও দেখে নিলেই যথেষ্ট। দূরবীণ প্রত্যেক গ্রামে রাখা সম্ভব না হলেও জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অধ্যয়ন গ্রামে গ্রামে হতে পারে। দূরবীণ কোন একটি কেন্দ্রীয় জায়গায় রাখা যেতে পারে এবং প্রয়োজন হলে সেখানে গিয়ে এর ব্যবহার করা যেতে পারে।

গবেষণার জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন; দার্শনিক বৃত্তি, হাতের সাহায্যে কাজ করার অভ্যাস এবং কুশলতা তথা ভৌতিক সাধন। গ্রামে দার্শনিক বৃত্তি নির্মাণ করার কোন বাধা নেই। এ আমি দেখেছি। কুশলতা পূর্বক কাজ করারও সেখানে যথেষ্ট অবকাশ আছে। কারণ সেখানে প্রত্যেক কাজ লোকেরা স্বহস্তে করে। অধিকাংশ ভৌতিক সাধন সেখানে সংগ্রহ করা যায়, সমস্ত সৃষ্টি সেখানে উন্মুক্ত। যে সাধন সর্বত্র উপলব্ধ হয় না, তার আলোচনা আমি উপরে করেছি।

এই প্রকারে গ্রামে গ্রামে সম্পূর্ণ শিক্ষা, অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার সুযোগ আছে এবং প্রত্যেক গ্রামে তার ব্যবস্থা হওয়া চাই। গ্রামে গ্রামে এর প্রারম্ভ এবং প্রস্তুতি এক ঘণ্টার পাঠশালা থেকে হওয়া প্রয়োজন। জ্ঞানকে ব্যাপক করতে হলে এবং সকলের জন্য এর দরজা উন্মুক্ত রাখতে হলে এই ভাবেই সম্ভব হবে।

পরিশিষ্ট—২

নূতন সমাজ-প্রতিষ্ঠা ও বুনিয়াদী শিক্ষা

গান্ধীজী পৃথিবীকে অহিংসার বাণী শুনাইয়াছেন। এইজন্য তাঁহাকে বর্তমান যুগের যুগ-পুরুষ মনে করা হয়। কিন্তু অহিংসার কথা বলিয়া গান্ধীজী কি কোন নূতন বাণী শুনাইয়াছেন? মহাবীর, বুদ্ধ, যীশু প্রভৃতি বহু সাধু পুরুষ যুগ যুগ ধরিয়া মানব-সমাজকে অহিংসার কথা শুনাইয়া আসিতেছেন। গান্ধীজী তাহা হইলে নূতন কী কথা শুনাইলেন?

গান্ধী : ধর্মচক্র প্রবর্তক

মহাত্মা গান্ধী 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ', কেবল এই সূত্রটিই বলেন নাই। বাস্তবিক পক্ষে তিনি অহিংস প্রতিরোধের পথ প্রদর্শন করিয়া অহিংসার ক্ষেত্রেও একটি মহান্ বিপ্লব ঘটাইয়াছেন। আমরা ইহাকে মহান্ বিপ্লব বলিতেছি, কেন না ইহা আজিকার যুগ-বিপ্লবের একটি বাহন হইয়াছে। ইহার কারণ হইল যে, বর্তমান যুগে অহিংসার ধর্মকথা একটি অনিবার্য সামাজিক প্রয়োজন হইয়া গিয়াছে। যে কোন ধর্মকথা যতক্ষণ ব্যক্তিগত জীবনের আঙ্গিক রূপে প্রচারিত হয়, ততক্ষণ তাহা সন্তবাণী বা ঋষিবাক্য-রূপে ব্যক্তির নৈতিক তথা আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধন মাত্র থাকে। কিন্তু যুগ-সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে যুগ-দাবীর সহিত যুক্ত হইলে উহা ধর্মচক্র-প্রবর্তক অর্থাৎ যুগবিপ্লবের বাহক হইয়া যায়।

যখন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রগতি অত্যন্ত দ্রুত হইতেছিল এবং ইহার পরিণাম-স্বরূপ বিরাট পরিকল্পনার সংগঠন হইয়া সাম্রাজ্যবাদ তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রচণ্ডভাবে প্রসারিত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে গান্ধীজীর জন্ম হয়। বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রবৃত্তি দেখা দেয়,

আবার যুদ্ধের আবশ্যকতার জন্য বিজ্ঞানের প্রগতি ঘটে এবং তাহার সহিত যুদ্ধবৃত্তির পুনর্বিকাশ হয়। এই বিষচক্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়াছে। মানুষ তাহার প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে সকল শক্তি ও বুদ্ধি লাগাইয়া থাকে। এজন্য বৈজ্ঞানিক যুগে ইহা অবশ্যম্ভাবী। মানব-সমাজ আপন হিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন নূতন আবিষ্কার করিতে লাগিল। তাহার ফলে ইহাই হইয়াছে যে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পরাকাষ্ঠা মানব-সমাজের অস্তিত্বকেই বিপদে ফেলিয়াছে। ধ্বংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের নিত্য-নূতন আবিষ্কার মানুষকে ভীতি-বিহ্বল করিয়াছে, আর তাহারই ফলে মানুষের সম্মুখে আত্মরক্ষার এক বিরাট সমস্যা দেখা দিয়াছে।

হিংসার সর্বগ্রাসী রূপ

আত্মরক্ষা সৃষ্টির মৌলিক প্রবৃত্তি। এজন্য যখনই সমাজে ইহার উপর বিপদ আসিয়া পড়ে তখনই মানুষ ব্যাকুল হইয়া বিপদ হইতে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করিতে থাকে। মানব-সমাজের উপলব্ধি হইয়াছে যে, এখন সেই সময় আসিয়াছে যখন বিজ্ঞান ও হিংসা এক সাথে চলিতে পারিবে না। অতীত কালে 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' এই কথা প্রচার করিয়াও বলা চলিত যে, ধর্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গ পাওয়া যাইবে। কারণ সেই সময় মানব-সমাজের অস্তিত্বের পক্ষে যুদ্ধ তত বিপজ্জনক ছিল না। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মান তখন নিম্ন থাকায়, যুদ্ধ সৈন্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত। সমাজের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার উপর তাহার প্রভাব পড়িত না। তখন এরূপ হিসাব করা সম্ভব ছিল যে, অল্প হিংসার দ্বারা যদি সমগ্র সমাজের অন্যায়ের প্রতিকার করা যায়, তবে তাহা গ্রহণীয় হইতে পারে। এজন্য 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' হইলেও সামাজিক অন্যায়ের প্রতিকার-রূপ ধর্মকার্যে হিংসাকেও একটি পুণ্যকর্ম-রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, এরূপ চিন্তা অতীত কালের লোকেরা করিতেন। ইহাতে তাঁহারা বিচলিত হইতেন

না, কারণ এইরূপে হিংসা সমগ্র সমাজের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে বিপদ বহন করিত না। কিন্তু আজ সেরূপ পরিস্থিতি নাই। আজ এমন কি সামাজিক অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যও যদি হিংসাকে গ্রহণীয় বলিয়া স্বীকার করা হয় তবে বিজ্ঞান-রূপী বাহনে উপবিষ্ট হইয়া হিংসার প্রচণ্ড মূর্তি অন্যায় প্রতিকারের পূর্বেই মানব-সমাজকে ধ্বংস করিবে এবং প্রতিকারের পর ভোগ করিবার জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখিবে না।

এখন প্রশ্ন হইল যে, বর্তমান যুগে মানব-সমাজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে অহিংসার প্রয়োজন অনিবার্য হইলেও উহাকে কি সহজে পাওয়া যাইবে? মানুষ সাধারণতঃ সংস্কারবদ্ধ হইয়া থাকে। আধুনিক ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতেই মানুষ সহিংস প্রতিকারের যশোগানে অভ্যস্ত হইয়া আছে। এইজন্য মানুষের স্বভাবে এই বৃত্তি বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। উহাকে কিরূপে উৎপাটিত করা যাইবে? আজ সমগ্র মানব-সমাজ বুদ্ধিপূর্বক হিংসা হইতে মুক্তি পাইতে চায় কিন্তু তাহার সংস্কার এই চক্র হইতে তাহাকে বাহিরে যাইতে দেয় না। তাই বুদ্ধির সাহায্যে সামাজিক পরিস্থিতিরও আমূল পরিবর্তন করা প্রয়োজন। পৃথিবীতে প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনেই প্রগতি হইয়া থাকে। মানবের ভাবধারা ও বুদ্ধিরূপী পুরুষ যখন পরিস্থিতি ও সামাজিক পরিবেশের সহিত মিলিত হয়, সেরূপ যখন আবার পরিস্থিতি ভাবধারার সহিত যুক্ত হয়, তখনই প্রগতির পথে সমবেত আচরণের সৃষ্টি হয়। অতএব যদি মানব-সমাজ আজ অনুভব করে যে, তাহার বাঁচিয়া থাকার জন্যই পৃথিবীতে অহিংস সমাজ স্থাপনার প্রয়োজন, তবে তাহাকে এরূপ সামাজিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতে হইবে যাহা দ্বারা হিংসাবৃত্তি পুষ্ট হইতে না পারে।

হিংসার মূল

আজ সমাজ-শাস্ত্রের সাধারণ বিদ্যার্থীরও এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, শাসন ও শোষণের প্রবৃত্তি হইতেই হিংসার উৎপত্তি হয়। অতএব

যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজে শাসন-ব্যবস্থা ও শোষণ-প্রতিষ্ঠানের অবশিষ্ট থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি ও সমাজ হিংসা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। এইজন্য অহিংস সমাজ রচনা করিতে, সমাজ শাসনহীন ও শোষণ অর্থাৎ শ্রেণীহীন হউক, ইহাই প্রয়োজন।

কিন্তু সমাজ শাসনহীন হইলে, শাসনমূলক সংস্থার অভাবে কি পৃথিবীতে এক অব্যবস্থিত সমাজ থাকিবে? এইরূপ হইলে যে-সমস্যার সমাধানকল্পে আমরা নৈরাজ্য আধারিত সমাজ গঠন করিতে চাই, সেই সমস্যাগুলিই আবার দেখা দিবে। অর্থাৎ হিংসা হইতে মানব-সমাজের অস্তিত্বের যে-বিপদ আসিয়াছে, তাহাকে দূর করিতে গিয়া অব্যবস্থার জন্য সমাজের ধ্বংসের দিকেই যাইতে হইবে। অতএব, আমাদের এরূপ সমাজ গঠন করিতে হইবে, যাহা শাসনহীন হইলেও পরিপূর্ণরূপে সুব্যবস্থিত থাকিবে।

দণ্ডশক্তির সত্যকার জন্মদাত্রী কে?

সমাজের সুব্যবস্থার জন্য কোন না কোন শক্তির প্রয়োজন আছে। বর্তমানে এই ব্যবস্থা দণ্ডশক্তির সাহায্যে চলে। কিন্তু এই শক্তির জন্ম কোথায় হইয়াছে? দণ্ডশক্তি কোন একটি স্বয়ম্ভূ বস্তু নয়। মূলে জনশক্তি আছে এবং এই জনশক্তিই আপন সামূহিক সামর্থ্যের রূপে দণ্ডশক্তিকে সৃষ্টি করিয়াছে। যদিও, জনশক্তিই দণ্ডশক্তির জননী তথাপি আজিকার যুগে দণ্ডশক্তি আপন জননীকেই নির্দলিত করিয়া নিজেই তাহার প্রভু সাজিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে শাসন-দণ্ড বিশ্বের জনগণকে এখন এরূপ ভাবে বশীভূত করিয়া ফেলিতেছে যে, জনগণের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য সংবিধান-পুস্তকের পাতা উল্টাইতে হয়। সমাজ-জীবনে তাহার কোন থই পাওয়া যায় না। এইরূপ অবস্থায় শাসনহীন সমাজ স্থাপন করিতে হইলে সমাজে এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে যে, শাসন অর্থাৎ দণ্ডশক্তির কোন প্রয়োজনই হইবে না; ইহা তখনই

হইতে পারিবে যখন মানবের প্রয়োজনীয়তা পূর্তির জন্য এবং সমাজের সুব্যবস্থা ও সঞ্চালনের জন্য পূর্ণরূপে জনশক্তি সংগঠিত হইয়া দণ্ডশক্তিকে অনাবশ্যক করিয়া দিবে।

ইহার জন্য প্রয়োজন হইল যে, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির যেন পূর্ণ বিকাশ হয়। তাহা হইলে সকলে একই শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় নিজেদের ব্যবস্থা সহযোগিতার ভিত্তিতে চালাইতে পারিবে।

বর্তমানে সমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে: একটি, ব্যবস্থা সঞ্চালনের নামে ক্ষুদ্র বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এবং অপরটি, উৎপাদন-কার্যের জন্য বিশাল শ্রমিক-শ্রেণী। অল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সামাজিক ব্যবস্থা সঞ্চালন ও বিতরণ রূপে সেবা করিবার অছিলায় সমাজকে নিরন্তর শোষণ করিতেছে। সমাজের জনসংখ্যা শোষক ও শোষিতরূপে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত থাকিলে সহযোগিতামূলক সমাজের কল্পনা করা স্বপ্নলোকে বিচরণের ন্যায় হইবে। ভক্ষক ভক্ষিতের মধ্যে আবার সহযোগিতা কি?

আমাদের লক্ষ্য

অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের দ্বারা সহযোগিতামূলক সমাজ-স্থাপনা করিতে হইলে শোষণের ভিত্তিস্তম্ভস্বরূপ শ্রেণী-বৈষম্যের সম্পূর্ণ বিনাশ প্রয়োজন। এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে, শাসন ও শোষণের প্রতিষ্ঠানগুলির শেষ না করিলে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌছাইতে পারিব না। কিন্তু আজ সমাজে শাসন ও শোষণের প্রতিষ্ঠানগুলি একটি অপরটির সহিত এরূপভাবে সংযুক্ত হইয়া আছে যে, সামূহিক বিপ্লব ব্যতীত মানবতার উদ্ধার তো দূরের কথা, সমাজের সম্মুখে প্রগতিও অসম্ভব বলিয়া দেখা যায়। অর্থাৎ নূতন সমাজ ও নূতন মানব গঠনের পথে আমাদিগকে এক মহান্ বৈপ্লবিক পদক্ষেপ করিতে হইবে।

গান্ধীজী এই লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার শেষের দিনগুলিতে নূতন

সমাজ গঠন করিবার উদ্দেশ্যে নূতন মানুষ সৃষ্টি করিবার উপর জোর দিতেছিলেন এবং এই জন্যই তিনি শিক্ষা-পদ্ধতিতে অহিংস বিপ্লবের কথা বলিয়াছিলেন। মানুষের বিকাশ লাভে শিক্ষাই একমাত্র অবলম্বন। যুগে যুগে মহাপুরুষগণ তাঁহাদের কল্পনা অনুসারে সমাজ নির্মাণের জন্য শিক্ষা-পদ্ধতিতে যে আমূল পরিবর্তন করিয়া গিয়াছেন, ইহাই হইল তাহার কারণ।

সহযোগিতামূলক সমাজের পথে

পূর্বে বলা হইয়াছে, শাসনহীন ও শ্রেণীহীন সমাজ রচনার জন্য প্রয়োজন হইল বিশ্বে দণ্ড-নিরপেক্ষ তথা জনশক্তি-সাপেক্ষ সহযোগী সমাজ গঠন করা। এজন্য সমাজের মৌলিক একক (unit) যে মানুষ, তাহাকে সকল বিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। ইহা কিরূপে হইতে পারে? আজও জনগণ অশিক্ষিত ও দরিদ্র। কোন এক বিশেষ শ্রেণীর নির্ভরশীল হইয়া তাহাদিগকে চলিতে হয়। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে এরূপভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে তাহার মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি বিকশিত হয়। গান্ধীজী সেজন্য তাঁহার বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষার মাধ্যমেই আমূল পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি উৎপাদনের প্রক্রিয়া এবং সামাজিক পরিবেশকে শিক্ষার মাধ্যম করিয়াছিলেন। উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে মাধ্যম স্বীকার করার ফলে, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই শিক্ষা লাভ করা সম্ভব হইবে। কারণ, তাহা না হইলে আজ যে বিরাট জনসংখ্যা প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনশ্রমে যুক্ত আছে, তাহারা শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইবে, কেননা উৎপাদনের কাজ হইতে বাহিরে আনিয়া তাহাদিকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিলে সমাজে উৎপাদন-কর্মই বন্ধ হইয়া যাইবে। শ্রেণী-বিশেষকে ব্যবস্থাপক শ্রেণীরূপে যখন রাখা হইবে না, তখন আজ যে অনুৎপাদক

শিক্ষিত সম্প্রদায় আছে, তাহাকে উৎপাদন-শ্রমে অভ্যাস করাইবার প্রয়োজন রহিয়াছে। তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি শিক্ষিত হইলে পর সমাজে শিক্ষিত ও বৈজ্ঞানিক উৎপাদকের একটি মাত্র শ্রেণী থাকিয়া যাইবে।

কিন্তু কেবল ইহাতেই তাহাদের মধ্যে স্বাবলম্বী ব্যবস্থার শক্তি আসিবে না। বাল্যাবস্থা হইতেই যদি সমাজের সমস্যাগুলির সহিত পরিচয় ও তাহাদের সমাধানের অভ্যাস না থাকে, তবে পরস্পরে সমবেতভাবে সমাজে সুব্যবস্থা রাখিতে পারিবে না। এইজন্য সামাজিক সমস্যাগুলির অধ্যয়ন ও তাহাদের সমাধানের প্রচেষ্টাকে শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম করিবারও প্রয়োজনীয়তা আছে।

বুনিয়াদী শিক্ষার এই পদ্ধতির প্রচলন করিয়া কিরূপে দণ্ড-নিরপেক্ষ সমাজের স্থাপনা করা যায়, পরে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

মানব-সমাজকে সজীব রাখিতে হইলে পৃথিবীর সমস্যাগুলির সমাধানে হিংসা পরিত্যাগের আজ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, আমরা ইহা দেখিয়াছি। এরূপ তখনই হইতে পারিবে যখন মানব-সমাজের প্রবৃত্তি হইতে হিংসাকে নির্মূল করা হইবে।

অহিংস সমাজের জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, হিংসা রহিত অর্থাৎ অহিংস-সমাজ রচনার জন্য পৃথিবীতে শাসনহীন ও শোষণহীন অর্থাৎ শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন রহিয়াছে। এইজন্য সমাজের সংগঠন এরূপ পদ্ধতিতে হওয়া আবশ্যক যাহাতে শাসনের কোন প্রয়োজনই না থাকে; অর্থাৎ সমাজের প্রবৃত্তি হইতে হিংসাকে নির্মূল করিয়া দেওয়া হইবে।

বুনিয়াদী শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গী

কিন্তু প্রশ্ন হইল, বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবৃত্তি কিরূপে চলিবে? তাহার রূপই বা কিরূপ হইবে? কী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া উহার সংগঠন হইবে?

উহার শিক্ষা-পদ্ধতিই বা কিরূপ হইবে? ইহা নির্ণয় করিবার দুইটি দৃষ্টিভঙ্গী আছে। একটি হইল, কোন্ পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করিলে শিশুর মস্তিষ্কে অল্পতম ভার চাপান হয়—অথচ সহজেই শিশুকে সকল বিষয়ের জ্ঞান দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় দিক হইল, বাল্যাবস্থা হইতেই এরূপভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে শিক্ষার্থীর মন সামাজিক বিপ্লবের দিকে সহজেই অগ্রসর হয়। সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের কোন ভাবনাই যাঁহাদের নাই, তাঁহারাও শিক্ষা-পদ্ধতির অদলবদল করিয়া থাকেন। ইহাদের দৃষ্টি প্রথম প্রকারের। ইহারা কেবল শিক্ষাদানের সুবিধার কথাই চিন্তা করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলস্বরূপ কিণ্ডারগার্টেন, মণ্টেসরী, ডাল্টন এবং প্রোজেক্ট পদ্ধতির আবিষ্কার হইয়াছে। এই সকল শিক্ষাপদ্ধতির আবিষ্কারকদের মনে সমাজের আমূল পরিবর্তনের কোন প্রশ্নই ছিল না। তাঁহারা এই টুকুই চিন্তা করিতেন যে, কিভাবে শিশুকে বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারের সহিত সহজে পরিচয় করান যায়।

শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি

প্রাচীনকালে ঋষি-বাক্যের আবৃত্তি এবং সেগুলি কণ্ঠস্থ করিলেই শিক্ষার প্রারম্ভ হইত। এমন কি, এরূপও বলা হইত যে, শাস্ত্রের বোধ অপেক্ষা সব শাস্ত্রের আবৃত্তি অধিক মহত্বপূর্ণ। যে-ভাবে আত্মরক্ষার প্রক্রিয়া জটিল হইতে জটিলতর হইতে লাগিল, সেইভাবে মানুষ প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অগ্রসর হইবার এই প্রচেষ্টার জন্য শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া শিক্ষালাভ করিবার ধৈর্য নষ্ট হইতে লাগিল। ইহা দ্বারা প্রয়োজনের পূর্তিও হইত না। এজন্য মানুষ আবৃত্তির পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া বুঝিবার পদ্ধতি গ্রহণ করিল। তাহা হইলেও সেই সময় অন্যান্য বিদ্বানেরা যাহা বলিয়াছেন তাহা নিজে বোঝা এবং বোঝান শিক্ষার একমাত্র পদ্ধতি ছিল। প্রকৃত অবস্থার সহিত উহার কোন সম্বন্ধই ছিল না। শিক্ষাবিদেরা

ইহাকেই যথেষ্ট মনে করিলেন না। শিক্ষা যাহাতে সহজ ও বিস্তৃত হয় তাহার জন্য প্রকৃত অবস্থার আশ্রয়ে জ্ঞান লাভের পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা অনুভব করেন; এবং তাহাই পূর্ণ করিতে কিণ্ডারগার্টেন, প্রোজেক্ট প্রভৃতি পদ্ধতির আবিষ্কার হয়।

একদিকে শিক্ষাবিদেরা শিক্ষাকে বিস্তৃত করিবার উদ্দেশ্যে নূতন নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করিতেছিলেন আর অপর দিকে গান্ধীজী অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে এবং তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গীতে শিক্ষার সমস্যার কথা চিন্তা করিতেছিলেন। শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকৃত মনোবিজ্ঞানের উপর আশ্রিত শিক্ষার সহজ পদ্ধতির অন্বেষণ করাই কেবল গান্ধীজীর কাজ ছিল না। এই চিন্তা তো তাঁহার ছিলই, কিন্তু তাঁহার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইহাই ছিল যে, কী ভাবে নূতন সমাজের জন্য নূতন মানুষের সৃষ্টি হইবে। অহিংস সমাজের জন্য শাসনহীন ও শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন, এই সিদ্ধান্তকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে শিক্ষার পদ্ধতি অন্বেষণ করিতে হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি দেশের নিকট বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

গান্ধীজীর প্রয়োগ

গান্ধীজী শিক্ষার নূতন প্রয়োগ দক্ষিণ আফ্রিকায় শুরু করিয়া সবরমতী আশ্রম পর্যন্ত চালু রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৩৮ সালে যখন কংগ্রেসের নিকট প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃত্বভার আসিয়াছিল তখনই তিনি সুব্যবস্থিত শিক্ষা-পদ্ধতির রূপ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। কারণ সেই সময় সর্বপ্রথম দেশ গঠনের জন্য ব্যাপক প্রয়োগের কিছু সুযোগ রাষ্ট্রনায়কেরা লাভ করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই গান্ধীজী মনে করিতেন যে, তাঁহার সহকর্মী ও অনুগামীরা তাঁহার বৈপ্লবিক ভাবধারা অনুযায়ী দেশের পুনর্গঠন করিবেন। শিক্ষায় মৌলিক বিপ্লব সাধন করিয়াই এই প্রকার সামাজিক

বিপ্লবের সৃজনাত্মক দিকের প্রারম্ভ হইতে পারিত। গান্ধীজী সমাজ গঠনের নূতন ধারণা জানাইবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার অহিংস বিপ্লবের যে কথা বলিতেন, ইহাই ছিল তাহার কারণ।

লোকেদের সন্দেহ

গান্ধীজীতো বুনিয়াদী শিক্ষাকে সামাজিক বিপ্লবের ভিত্তি বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং দেশের নিকট উহাকে ঐরূপেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দেশবাসী গান্ধীজীর ধারণা অনুযায়ী রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবে স্বীকৃত হয় নাই। তাহারা কেবল স্বাধীনতা অর্জনের অনিবার্য নেতারূপে গান্ধীজীকে স্বীকার করিয়াছিল। সেইজন্যই গান্ধীজীর কথা অনুযায়ী বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু চরখাকে দেশ আজ গ্রহণ করিতে পারে নাই। এমন কি যে-সব নেতারা গান্ধীজীর সহিত আজীবন থাকিয়াছেন এবং তাঁহারই মত স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাইয়াছেন, তাঁহাদের মনে আজ পর্যন্ত চরখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্দেহ রহিয়াছে।

বুনিয়াদী শিক্ষার দৃষ্টিকোণ

১৯২১ সালে গান্ধীজীর সহকর্মিগণ যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে চরখাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেরূপ ১৯৩৮ সালেও তাঁহারা বুনিয়াদী শিক্ষাকে নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে লাগিলেন। শিক্ষাকে প্রকৃত অবস্থার সহিত যুক্ত করিবার যে পরম্পরা চলিয়া আসিতেছিল ইহাকে সেই পথেরই এক পদ অগ্রসর অবস্থা মাত্র বলিয়া কেহ কেহ মনে করিলেন। বাস্তবিক বিশ্বের সকল শিক্ষাবিদই ইহাকে সেই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিয়াছেন। কেহ কেহ আবার ইহাকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইবার উদ্দেশ্যে জন-সম্পর্ক স্থাপন করিবার বিস্তৃত উপায় বলিয়া মনে করিলেন। চরখা চালাইবার একটি নূতন উপায় বা অছিলা বলিয়াও কেহ কেহ মনে করিলেন।

কিছু লোক নিশ্চয় এরূপ ছিলেন যাঁহারা ইহাকে নূতন বিপ্লবের বাহনরূপে চিনিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা নগণ্যই ছিল।

গান্ধীজীর অধিকাংশ সহকর্মীই বুনিয়াদী শিক্ষাকে উপরি-উক্ত প্রথম দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিতেন। অর্থাৎ তাঁহারা ইহাকে শিক্ষার আর একটি শ্রেষ্ঠতর উপায় মাত্র বলিয়া মনে করিতেন। প্রথম প্রথম তাঁহারা ইহার মর্ম বুঝেনই নাই। ইহাকে গান্ধীজীর পাগ্‌লামীর এক নূতন নমুনা বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ লোকদের এই চিন্তাধারাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য আচার্য কৃপালনী তাঁহার বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে লিখিত পুস্তকটির নাম রাখিয়াছিলেন 'সর্বশেষ বাতিক' (The latest fad)।

ক্রমশঃ শিক্ষাবিদেরা অনুভব করিলেন যে, শিক্ষাকে প্রকৃত রূপদানের পথে ইহা একটি বড় পদক্ষেপ। তাঁহারা ইহার পক্ষে আপন রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দেশনেতাগণ গান্ধীজীকে পাগল মনে করিতে পারেন; কিন্তু শিক্ষাবিদ্‌দের কথা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। যাহাই হউক, তাঁহারা বুনিয়াদী শিক্ষার প্রচারের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হইবার ফলে স্থানে স্থানে সরকারী রীতিতে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োগ হইতে লাগিল এবং অবশেষে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর ইহার প্রসার কিছু বর্ধিত হইয়াছে।

বুনিয়াদী শিক্ষা কেন ব্যাপক হইতে পারে নাই

সবই হইল। কিন্তু কেবল শিক্ষণ কলার প্রয়োগ মনে করিবার জন্য ইহার ব্যাপক প্রসারে কোন সরকারেরই উৎসাহ রহিল না। তাঁহারা কোথাও কোথাও ইহার প্রচলন করিয়া পুরাতন পদ্ধতির সহিত এই পদ্ধতির তুলনামূলক অধ্যয়ন করিতে চাহিলেন। বুনিয়াদী শিক্ষার পশ্চাতে যে নব-সমাজ গঠনের নিশ্চিত ধারণা ছিল, তাহার উপর আস্থা না থাকায় ইহার অধিক তাঁহারা চিন্তাও করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ এই যে,

ইংরেজ রাজত্বের সময় তাহাদের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিকে যে-সকল নেতা দেশের পক্ষে মারক বলিয়া মনে করিতেন, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সেই পদ্ধতিকে বন্ধ করা তো দূরের কথা, তাহার অত্যধিক প্রসারের গতি আটকাইবারও সাহস তাঁহাদের হইল না। অবশ্য আজও ঐ পদ্ধতির নিন্দা করিবার কোন সুযোগই তাঁহারা ছাড়েন না। পুরাতন শিক্ষা-পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট নন, বুনিয়াদী শিক্ষায় আস্থা নাই, তৃতীয় কোন পদ্ধতির কল্পনাও নাই ; এরূপ অবস্থায় তাঁহারা নিরুপায় হইয়া রহিয়াছেন। "যেরূপ চলিত সেরূপই চলুক" এই সুগম পথে পুরাতন কুসংস্কারাচ্ছন্ন শিক্ষাবিদ্দের হস্তে শিক্ষাকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন।

বুনিয়াদী শিক্ষার বেশে পুরাতন শিক্ষা

বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য লোকেদের উপর গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব আছে। কয়েকজন নিরপেক্ষ চিন্তাশীল ও শিক্ষাবিদের স্বীকৃতি রহিয়াছে। এইজন্য যদিও বিভিন্ন রাজ্য-সরকার পুরাতন শিক্ষাকে রাজকীয় শিক্ষার মেরুদণ্ড বলিয়া মনে করেন তথাপি তাঁহারা নিজেদের কর্মসূচীতে কোথাও কোথাও বুনিয়াদী শিক্ষার নামকেও স্থান দিয়াছেন। সরকারী অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কেন্দ্রীভূত বৃহৎ শিল্পের সম্মুখে খাদি ও গ্রাম্য শিল্পের যে স্থান আছে, ইহারও স্থান তদনুরূপ। রাষ্ট্রের মূল আর্থিক নীতি কেন্দ্রীয় শিল্প-করণ বজায় রাখিয়া কিছু খাদি ও গ্রামোদ্যোগ চালাইবার ফলে ইহাদের মধ্যে জীবনের সঞ্চার হইতে পারে নাই। অনুরূপ ভাবে পুরাতন শিক্ষা-পদ্ধতিকেই রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতিরূপে রাখিয়া কেবল স্থানে স্থানে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রচলন করায় উহা সঞ্জীবিত হইতে পারে নাই। কেবল সঞ্জীবিত হইতে পারে নাই এরূপ নয়, বুনিয়াদী শিক্ষার যেটুকু কাজ চলিতেছে, তাহা পুরাতন কুসংস্কারাচ্ছন্ন শিক্ষাবিদ্দের সঞ্চালন ও পরিচালনায় থাকিবার ফলে মাঝে মাঝে তাহার আমূল পরিবর্তনের প্রচেষ্টা হইতেছে। ইহার

ফলে বস্তুতঃ বুনিয়াদী শিক্ষার বেশে তাহা পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতিই রহিয়া গিয়াছে।

বিনোবার ভয়

এই জন্যই বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে বিনোবাজীকে দুঃখের সহিত নিম্নলখিত কথাগুলি বলিতে হইয়াছে।

"বুনিয়াদী শিক্ষার যে ব্যাপক প্রয়োগ আজ হইতেছে, তাহা বিভিন্ন রাজ্যের সরকারই করিতেছেন। ইহার পরিণাম-স্বরূপ সর্বত্র বুনিয়াদী শিক্ষার 'বানরীকরণ' চলিতেছে। বুনিয়াদী শিক্ষার পশ্চাতে একটি জীবন-দর্শন আছে। এই জীবনদর্শন গ্রহণ না করিয়া যখন উহার আংশিক গ্রহণ ও বিকৃত অনুকরণ হয় তখন বুনিয়াদী শিক্ষার বদনাম হওয়া ব্যতীত ইহা হইতে কোন সিদ্ধিলাভের আশা করা যায় না। ইহাই হইতেছে। বিভিন্ন রাজ্যে বুনিয়াদী শিক্ষার যে প্রয়োগ হইয়াছে, বোধহয় উহাদের মধ্যে বিহারেই সর্বাধিক সততার সহিত ইহা করা হইয়াছে। কিন্তু উহারও যে দশা আমি দেখিয়াছি তাহাতে ভয় হয় যে, বোধহয় বুনিয়াদী শিক্ষার সমাধি রচিত হইতেছে।"

বিহারে বুনিয়াদী শিক্ষার পরিণাম

ফলতঃ দেশে ব্যাপকভাবে যে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা চলিতেছে, তাহা জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই; উপরন্তু আকাঙ্ক্ষিত পরিণামের দিকে না যাইতে পারায় সত্য সত্যই উহার বদনাম হইতেছে। প্রারম্ভে এইরূপ অবস্থা ছিল না। যখন গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষার সিদ্ধান্ত তথা জীবনদর্শনের কথা বলিয়াছিলেন, তখন জনগণ সাদরে ইহাকে স্বাগত জানাইয়াছিলেন। এই জন্যই বিহার-সরকার যখন ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যে সকল লোক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি দান করিবেন, সেই সকল গ্রামেই বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে, তখন ঐ রাজ্যের গ্রাম

হইতে এত ভূমি দান পাওয়া যাইতে লাগিল যে, অতগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করা রাজ্য-সরকারের ক্ষমতার বহির্ভূত বলিয়া মনে হইল। কিন্তু কিছুদিন চলিবার পর জনসাধারণ নিরাশ হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, পুরাতন পদ্ধতিতে যে বই পড়িবার ব্যবস্থা ছিল, তাহা বন্ধ হইয়াছে অথচ নবীন জীবনের কোনরূপ আনন্দই শিশুদের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহারা কোন উৎপাদক-শিল্পে কুশল হয় নাই, আবার পুস্তকের জ্ঞানও লাভ করিতে পারে নাই। তাহার পরিণাম ইহাই হইয়াছিল যে, উহারা কোন কাজেরই হয় নাই। কেন এরূপ হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে।

একাঙ্গী গুণ গ্রহণ

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সরকার এবং দেশের শিক্ষা-জগৎ বুনিয়াদী শিক্ষার মূল তত্ত্বকে ছাড়িয়া উহার বাহ্যিক রূপকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ লোকেরা এই পদ্ধতিকে শিক্ষণ-কলার সুবিধার দৃষ্টিতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন বস্তুর চেতন আত্মাকে ছাড়িয়া উহার জড়দেহ গ্রহণ করিলে যে-অবস্থা হয়, দেশে বুনিয়াদী শিক্ষারও সেই দশা হইয়াছে। প্রকৃত অবস্থার সহিত জ্ঞানলাভকে যুক্ত করিবার প্রচেষ্টায় পূর্বে যে-সকল পদ্ধাতর আবিষ্কার হইয়াছিল, সেইগুলিতে প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত জীবনের অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমের কল্পনা ছিল না; প্রকৃত বস্তুর উদাহরণ দিয়া বুঝাইবারই বাসনা ছিল। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ইহা অসম্পূর্ণ ছিল। আজ স্থানে স্থানে যে-ভঙ্গীতে বুনিয়াদী শিক্ষা চালান হইতেছে, তাহা দেখিলে এই কথাই মনে হয় যে, এই মনোবৈজ্ঞানিক পূর্ণতা হারাইয়া শিক্ষাবিদ্ ও সরকারী বিভাগ ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু কেবল এই টুকুতেই বুনিয়াদী শিক্ষার যে উদ্দেশ্য তাহা পূর্ণ হয় না, উপরন্তু ইহার আংশিক গ্রহণের ফলে বিকলাঙ্গ হইয়া ইহা সমাজ-জীবনকে পঙ্গু করিয়া

দিতে পারে। সেই জন্যই বিনোবাজী বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে তাঁহার চিন্তাধারা প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন :

"আজ বুনিয়াদী শিক্ষার যে-গুণ গৃহীত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা এতদূর একাঙ্গী যে, ঐ রূপে উহা গ্রহণ করা বিপদাশঙ্কা হইতে মুক্ত নয়।"

বস্তুতঃ বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে প্রকৃত জীবনের অভিজ্ঞতা লাভের যে কথা চিন্তা করা হইয়াছে, সেখানে উহার বাস্তব রূপায়নে দেশের সত্যকার পরিস্থিতির সহিত কোন সামঞ্জস্য রাখা হয় নাই; অর্থাৎ বস্তুস্থিতি হইতে তাহাকে দূরে রাখা হইয়াছে। এইজন্য সাধারণ শিক্ষণ-কলার দৃষ্টিতে উহা অব্যবহার্য হইয়া গিয়াছে।

বুনিয়াদী শিক্ষা খেলনা হইয়া রহিয়াছে

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ কর্মের প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে জ্ঞানলাভের পদ্ধতিকেই উত্তম মনে করা হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দেশের কর্ণধারগণ যখন বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন যে, যে-কর্মের প্রক্রিয়াকে গান্ধীজী শিক্ষার মাধ্যমরূপে স্বীকৃতি দিয়াছিলেন, সেই কর্মকেই তাঁহারা স্বীকার করেন নাই।

গান্ধীজী হাতের কাজকেই শিক্ষার ভিত্তি মনে করিতেন; কিন্তু দেশের নেতৃবৃন্দ জাতীয় জীবনে হাতের কাজের জন্য কোন স্থান রাখেন নাই। ইহাকে অর্থনৈতিক জীবনের কেন্দ্ররূপে স্বীকার না করিয়া বড় বেশি হইলে ইহাকে একটি খেলনা রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। এই কারণেই বুনিয়াদী শিক্ষা জাতীয় জীবনের ভিত্তিস্বরূপ না হইয়া একটি তামাসার জিনিস রূপেই রহিয়া গিয়াছে।

জাতীয় অর্থনীতির প্রভাব

শিক্ষাকেন্দ্রে যে সকল বিদ্যার্থী শিক্ষালাভ করিবে, তাহারা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তো চিন্তা করিবে। তাহারা দেখিতেছে যে, বার বৎসর

যাবৎ যে সব হাতের কাজের চর্চা করান হয়, জাতীয় অর্থনীতিতে তাহার কোন স্থান নাই। যেখানে ঐ শিল্পেরই কোন স্থান নাই সেখানে শিল্পীর স্থান কোথায়? এই ব্যবস্থার অর্থ তাঁহাদের মাথায় আসে না। এইজন্য তাহারা মনে করে যে, এই প্রকার হস্ত-শিল্পের চর্চা করিলে তাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইবে। এই অন্ধকারময় ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইতে কাহারই বা আগ্রহ থাকিতে পারে? পরিণাম ইহাই হয় যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুসারে উৎপাদনের প্রক্রিয়া শিখিতে কোন বিদ্যার্থীরই মন লাগে না আর শিক্ষকও ইহাতে কোন রস পান না। যাহার স্থান সমাজে নাই, তাহার প্রতি আগ্রহ না হওয়া স্বাভাবিক।

সরকারের অর্থনৈতিক কাঠামো ও বুনিয়াদী শিক্ষা

জ্ঞানলাভের মাধ্যমরূপ কর্ম-প্রণালীকেই অস্বীকার করিয়া তাহার প্রতি কোনরূপ আগ্রহ না থাকিলে সেই কর্ম হইতে জ্ঞানের আশা করা দুরাশা মাত্র। এই জন্যই আজিকার বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ দক্ষ কারিগরও হয় না, আর কোন জ্ঞানও অর্জন করিতে পারে না। কারণ, বুনিয়াদী শিক্ষার মূলেই যখন কোন তথ্য নাই, তখন ইহা হইতে কিরূপে জ্ঞান পাওয়া যাইবে? বাস্তবিক সরকারী শিক্ষা-পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণে যে লাভ হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল, আজিকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সহিত কোনরূপ সামঞ্জস্য না থাকায় উহা লাভজনক না হইয়া হানিকারক হইতেছে। শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য তো সফল হয়ই নাই, অধিকন্তু দেশের শ্রম ও অর্থের অপব্যবহার হইতেছে। সরকারী বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এই আশা লইয়া শিক্ষার মাধ্যম-স্বরূপ হাতের কাজের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে যে, উৎপাদনের দ্বারা যে-আয় হইবে, তাহাতে শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের উপর ভার কম পড়িবে। কিন্তু

পরিণাম উল্টা হইতেছে। উৎপাদন হইতে আয় তো দূরের কথা, অনিচ্ছা-পূর্বক কাজ করিবার ফলে উৎপাদনের উপকরণে যে পুঁজি ব্যয় করা হয়, তাহাও নষ্ট হইতেছে। ফলে এই শিক্ষা স্বাবলম্বী না হইয়া পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতর ব্যয়বহুল হইতেছে। এই জন্যই প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু যখনই বুনিয়াদী শিক্ষার কথা চিন্তা করেন, তখনই ইহার ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া ঘাবড়াইয়া যান। কারণ, যখন তিনি ইহার হিসাব করিতে বসেন তখন দেখেন যে, দেশব্যাপী বুনিয়াদী শিক্ষা চালাইলে সরকারের সমস্ত আয়ও ঐ ব্যয়নির্বাহের পক্ষে পর্যাপ্ত হইবে না।

সমাজ-জীবনের ভ্রান্ত ধারণা

ব্যাপক বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন বিফল হইবার আর একটি কারণ আছে। তাহা হইল সমাজ-জীবনের মূল্যবোধের প্রকৃত ধারণা না থাকা। বুনিয়াদী শিক্ষা সমাজে এক নূতন মূল্য সৃষ্টি করিতে চায়। উহা শোষণহীন সমাজ গঠন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রেণী-বৈষম্য দূর করিয়া এক নূতন মানবতার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক। যতদিন দেশের উৎপাদক-শ্রেণী ক্ষুধার্ত থাকিবে এবং উপরের মুষ্টিমেয় লোক তাহাদেরই শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের বণ্টন করিয়া জাঁকজমকে থাকাকেই নিজেদের এবং দেশের সম্মান বলিয়া মনে করিবে, ততদিন এই নূতন মানবতার প্রতিষ্ঠা হইবে না। দেশের কর্ণধারগণ স্পষ্টই বলেন যে, দেশের প্রতিনিধি, ব্যবস্থাপক ও রাষ্ট্রদূতগণ জাঁকজমকের সহিত যতদিন না থাকিবেন, ততদিন দেশের মর্যাদাও বজায় থাকিবে না। মর্যাদা সম্পর্কে এইরূপ ধারণা থাকিলে দেশের একটি বালকও স্বাবলম্বী জীবনযাপন করিতে ইচ্ছুক হইবে না। শিশু যখন শিক্ষা গ্রহণ করিতে যায় তখন তাহার মনে এক আনন্দের প্রবাহ থাকে। সে ভাবে, শিক্ষালাভের পর সে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। দেশ যাঁহাদিগকে মাননীয় বলিয়া স্বীকার করে,

স্বভাবতঃই তাঁহাদের নিকট হইতে শিশু মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা পাইবে। এইজন্যই, আজ শিশুর অভিভাবক অথবা শিশু, কেহই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন না। কারণ, বুনিয়াদী শিক্ষায় যে মূল্যবোধ রহিয়াছে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে দেশের নেতৃবৃন্দ চেষ্টা করিতেছেন না, উপরন্তু তাঁহারা উহাকে হীন চক্ষে দেখিয়া থাকেন। মাঝে মাঝে তাঁহারা যেসব ঘোষণা করেন, সেগুলি হইতেই আমরা ইহা দেখিতে পাই। এইজন্যই কিছুদিন হইতে যখন দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দেশের বেকার-সমস্যা ও উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তিতে বিব্রত হইয়া বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তখন তাঁহাদের সময়োপযোগী সতর্কবাণী দিবার উদ্দেশ্যে বিনোবাজীকে বলিতে হইয়াছে,

"বর্তমানে বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া দেখা যাইতেছে এবং তাহারই পরিণাম-স্বরূপ ছাত্রগণ উচ্ছৃঙ্খল হইতেছে; এখন তাই নেতৃবৃন্দ বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন। কিন্তু বেকার-সমস্যা দূর করা এবং শৃঙ্খলা স্থাপন করা বুনিয়াদী শিক্ষার ন্যূনতম উদ্দেশ্য। ইহার মূল উদ্দেশ্য ইহাই যে, ইহা সমাজে নূতন মূল্যের স্থাপনা করিতে চায়। এই নূতন মূল্যের প্রতি আকর্ষণ থাকিলেই বুনিয়াদী শিক্ষার সত্যকার গুণগ্রহণ করা যাইবে।"

অতএব সরকারী নেতৃবৃন্দ যদি বুনিয়াদী শিক্ষার তৎকালিক লাভের জন্য উহা চালাইতে মনস্থ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদিগকে ইহার সহিত দেশের আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থার এবং দেশের জীবন-দর্শনে বুনিয়াদী শিক্ষার মূল তত্ত্ব অনুযায়ী বৈপ্লবিক পরিবর্তন করিতে হইবে। যদি তাঁহারা এরূপ না করিতে পারেন, তবে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচলনের নিষ্ফল প্রচেষ্টায় দেশের সর্বসাধারণের অর্থের অপব্যয় করা তাঁহাদের পক্ষে অনুচিত হইবে।

নূতন মানব-সৃষ্টি

বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের দ্বারাই হইয়াছে। এই প্রকার প্রসারের চেষ্টা কি ভাবে এবং কেন নিষ্ফল হইয়াছিল, সেই সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। এই অসফলতার জন্য দেশের জনসাধারণ বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে নিরাশ হইতেছেন। এইরূপ হওয়া স্বাভাবিক। আশাতীত আশা হইতে সহজেই নিরাশার জন্ম হয়। বোধহয় এই ক্ষেত্রেও সেইরূপ হইয়াছে।

নিরাশার কারণ

বুনিয়াদী শিক্ষা একটি নির্দিষ্ট মূল্যের আধারে নূতন সমাজ রচনার জন্য বিপ্লবের বাহন। সুতরাং উহা বিপ্লবকে আপন স্কন্ধে বহন করিয়াই অগ্রসর হইতে পারে। অর্থাৎ বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রগতি হইতে পারে। বৈপ্লবিক আন্দোলনও আবার বাহন বিনা অগ্রসর হইতে পারে না। ইহার অর্থ হইল যে, গান্ধীজীর আদর্শানুসারে সামাজিক বিপ্লব এবং বুনিয়াদী শিক্ষা, একে অপরের সাহায্যেই অগ্রসর হইতে পারে। এইরূপ বিপ্লবের আশা কোন সরকারের নিকট হইতে করা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ সরকার বিপ্লব করিতে পারে না। উহা জনশক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষা যদি বিপ্লবের বাহনই হইয়া থাকে, তবে সরকারের ভরসায় উহার সম্পাদন করিবার আশা করার জন্যই জনসাধারণের মনে নিরাশার সঞ্চার হইয়াছে।

প্রয়োগের প্রারম্ভ

এই কারণেই গান্ধীজী ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের নিকট তাঁহার শিক্ষার পরিকল্পনার কথা জানাইবার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুস্তানী তালিমী সংঘের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কারণ গান্ধীজীর নিকট ইহা স্পষ্ট ছিল যে, বৈপ্লবিক আন্দোলনের জন্য স্বতন্ত্র বৈপ্লবিক নেতৃত্বেরও প্রয়োজন।

গান্ধীজীর নির্দেশে দেশের স্থানে স্থানে গঠনমূলক সংস্থা তথা কর্মীদের দ্বারা বুনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োগও শুরু হয়। স্বতন্ত্র গঠনমূলক সংস্থার দ্বারা অতি সামান্য প্রারম্ভ হইতে না হইতেই দেশের অন্তিম স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু হইয়া যায় এবং এই কাজের প্রগতিও বন্ধ হয়।

সমগ্র গ্রাম-সেবার ভূমিকা

১৯৪৪ সালের শেষের দিকে গান্ধীজী যখন জেল হইতে বাহিরে আসেন, তখন তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, দেশে ইংরেজ রাজত্ব আর থাকিতে পারে না। তিনি গঠনকর্মীদের বলিয়াছিলেন যে, ইংরেজ এখন চলিয়া যাইতেছে, আমরা যত শীঘ্র ভাবিতেছি, বোধহয় তাহার পূর্বেই উহারা চলিয়া যাইবে। এখন আমাদের শোষণহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সেই সময়েই তিনি চরখা-সংঘ এবং তালিমী সংঘের সম্মুখে আপন বৈপ্লবিক পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। চরখা-সংঘকে তিনি স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছিলেন যে, এখন চরখা দ্বারা সাহায্য প্রদানের যুগ চলিয়া গিয়াছে। এখন আমাদের এই কথাই প্রমাণ করিতে হইবে যে, চরখা অহিংসার প্রতীক। এই উদ্দেশ্যেই তিনি চরখা-সংঘের কর্মসূচীতে আমূল পরিবর্তন করিবার কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, এখন চরখা প্রভৃতির একাঙ্গী কর্মক্রমের দ্বারা কাজ হইবে না। এখন গঠনমূলক কার্যক্রমের প্রত্যেকটি অঙ্গকে সমগ্র গ্রাম-সেবার রূপে রূপান্তরিত করিতে হইবে। এই কারণে তিনি দেশের সাতলক্ষ গ্রামের জন্য সাত লক্ষ যুবকের সেবা চাহিয়াছিলেন, যাঁহারা শরীর-শ্রমের দ্বারা নিজেদের ভরণপোষণ করিয়া সমগ্র গ্রাম-সেবার কাজ করিবেন।

শোষণহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠার বিপ্লব

গান্ধীজী দেশে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেন। শরীর-শ্রমের দ্বারা যাহারা উৎপাদন করে, তাহাদের একটি শ্রেণী আর ব্যবস্থা-

বিতরণের অছিলায় অনুৎপাদক উপভোক্তার আর একটি শ্রেণী থাকিলে সমাজে শোষণ বন্ধ হইতে পারে না, ইহা সর্বসম্মত। এইজন্য সমগ্র গ্রাম-সেবার বৈপ্লবিক পরিকল্পনার দ্বারা এইরূপ শ্রেণী-বিভেদ দূর করিয়া উৎপাদকের একটিমাত্র শ্রেণীর সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই গান্ধীজীর অভীপ্সা ছিল। এইরূপ শ্রেণীহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠার বৈপ্লবিক আন্দোলন বৈপ্লবিক সেবকদের দ্বারাই পরিচালিত হইতে পারে। এ পর্যন্ত স্বাধীনতাপ্রাপ্তির আন্দোলনই চলিতেছিল। স্বাধীনতা লাভের কাজ সাধারণ যুদ্ধের কাজ। সমাজ-ব্যবস্থার কোনরূপ পরিবর্তনের কল্পনা না করিয়াও পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাধীনতার যুদ্ধ পরিচালিত হইয়াছে। আর আজও সেইরূপ যুদ্ধ করা হইয়া থাকে। সুতরাং ইংরেজী রাজত্ব অবসানের কাজ এইরূপ সেবকদের দ্বারাও হইতে পারিত, যাঁহারা জীবনে বিপ্লব না করিয়াও কেবল ত্যাগ ও সাহসের শক্তিতে সংগ্রাম করিবার যোগ্য হইতেন। কিন্তু শোষণহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠার বিপ্লব সেইরূপ সেবকেরাই করিতে পারেন, যাঁহারা নিজেদের জীবনে বিপ্লব করিয়াছেন ; অর্থাৎ যাঁহারা নিজেদের শ্রেণী-পরিবর্তন করিয়া উৎপাদক-শ্রেণীতে বিলীন হইয়া গিয়াছেন।

স্তর নিম্ন করায় ত্যাগ এবং প্রকৃতি পরিবর্তনে বিপ্লব

কোন আদর্শের জন্য ত্যাগ করা এক কথা আর জীবনে বিপ্লব করা অন্য কথা। একজন অনুৎপাদক উপভোক্তা নিজেকে সেই অবস্থায় রাখিয়াও ত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু বিপ্লব করিতে হইলে তাঁহার পক্ষে নিজেকে উৎপাদকে পরিণত হইতে হইবে। একজন কলেজের অধ্যাপক মাসে পাঁচ শত টাকা বেতন পান। যদি তিনি চাকরি ছাড়িয়া কোন জাতীয় বিদ্যালয়ে অথবা কোন গঠনকর্ম-প্রতিষ্ঠানে মাসিক একশত টাকা বেতনে সেবা করা আরম্ভ করেন, কিন্তু নিজের শরীর-শ্রমে কিছুই উৎপাদন না করেন তবে সেই অধ্যাপক নিজের জীবনে কেবল ত্যাগই করিবেন। কিন্তু যদি তিনি

একশতর স্থানে দেড়শত গ্রহণ করেন কিন্তু প্রারম্ভে তাহার মধ্য হইতেই মাসে দশ টাকার সামগ্রী শরীর-শ্রমের দ্বারা এই সংকল্প লইয়া উৎপাদন করেন যে, তিনি ক্রমশ এই উৎপাদন-প্রক্রিয়ার কাজে অগ্রসর হইয়া স্বাবলম্বী হইয়া পূর্ণরূপে উৎপাদক-শ্রেণীতে বিলীন হইয়া যাইবেন, তবে তিনি নিজের জীবনে বিপ্লবের পথে পদক্ষেপ করিবেন। সংক্ষেপে, কোন ভাল কাজের জন্য জীবনের স্তর নিম্ন করা ত্যাগ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জীবনধারণের প্রকৃত পরিবর্তনে বিপ্লব হয়।

এ পর্যন্ত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামই ছিল জাতীয় আন্দোলনের স্বরূপ। গঠনমূলক কার্যক্রম সাহায্য প্রদানের রূপেই বর্তমান ছিল। এই স্বাধীনতার সংগ্রাম করিবার জন্য এবং পরোপকারী কাজ করিবার জন্য ত্যাগ যথেষ্ট ছিল। কিন্তু গান্ধীজী যে সমাজ-বিপ্লবের আন্দোলন চালাইতে চাহিতেন তাহার জন্য সেবকদের আরও অগ্রসর হইবার প্রয়োজন ছিল। এই কাজের জন্য প্রয়োজন ইহারই ছিল যে, সেবক নিজের জীবনে পূর্ণরূপে বিপ্লব করিবেন। এই কারণেই গান্ধীজী সেবকদের মনোযোগ সর্বপ্রথম শরীর-শ্রমের দ্বারা জীবন যাপনের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

নব মানবরূপী শিবের প্রতিষ্ঠা

এই প্রকার বিপ্লবী সেবকদের দ্বারা সমগ্র গ্রাম-সেবার আন্দোলন চালাইবার জন্য তিনি চরখা-সংঘকেই বলিয়াছিলেন, কারণ চরখা-সংঘই এইরূপ এক ব্যাপক প্রতিষ্ঠান ছিল যে এই কাজ আরম্ভ করিতে পারিত। সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী ইহাও বুঝিতেন যে, কেবল সামাজিক বিপ্লবের আন্দোলনের দ্বারা বিপ্লব সংগঠিত হইতে পারিবে না। যেখানে একদিকে ইহা আবশ্যক যে, উৎপাদক-শ্রেণী প্রয়োজনের পূর্তি ও আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার জন্য স্বাবলম্বী হইয়া, ব্যবস্থা ও বিতরণের নামে যে-শ্রেণী তাহাদের শোষণ করিতেছে, সেই শ্রেণীকেই অনাবশ্যকে পরিণত

করিবার চেষ্টা করিবে, সেখানে নূতন স্বাবলম্বী সমাজের প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য অনুরূপ নূতন মানব-সৃষ্টিরও প্রয়োজন। সমাজ-বিপ্লবের গঙ্গাবতরণের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ধারণ করিবার জন্য নূতন মানবরূপী শিবের প্রতিষ্ঠা যদি না হয় তবে বিপ্লবের গঙ্গা অবশ্যই প্রতিবিপ্লবের পাতালে তিরোহিত হইয়া যাইবে। এই সনাতন তথ্যটি গান্ধীজী জানিতেন। বস্তুতঃ গান্ধীজীর বৈপ্লবিক দর্শনের ইহাই ছিল বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসে পূর্বে যে সব বিপ্লবের কল্পনা করা হইয়াছিল, তাহা সবই একাঙ্গী। কিছু লোক কেবল সমাজ-বিপ্লবের কথাই চিন্তা করিয়াছিলেন, আবার কিছু লোক তাঁহাদের সমস্ত চিন্তা ব্যক্তির বিকাশের উপরই কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন।

গান্ধীজীর আহ্বান

উপরোক্ত কারণগুলির জন্যই গান্ধীজী একদিকে চরখা-সংঘকে চরখা দ্বারা সাহায্য প্রদানের সীমাবদ্ধ কাজ ত্যাগ করিয়া সমগ্র গ্রাম-সেবার দ্বারা জনশক্তি উদ্‌বোধনের বিশাল কার্যক্রম গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন, আবার অন্য দিকে হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘকে বলিয়াছিলেন যে, নঈ তালিমকে এখন বুনিয়াদী শিক্ষার জলাশয় হইতে বাহির করিয়া মহাসমুদ্রে লইয়া যাইতে হইবে। এখন শিক্ষার সময় জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত হওয়া উচিত। এইভাবে গান্ধীজী সমগ্র গ্রাম-আন্দোলন ও বুনিয়াদী শিক্ষাকে সমানরূপে একসাথে চালিত করিয়া আন্দোলন ও নির্মাণ-কার্যকে পরস্পরের সহায়তায় অগ্রসর করিতে চাহিতেন। তাহাতে বিপ্লবের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সংগঠনও হইতে থাকিবে আর তাহার ফলে প্রতিবিপ্লবের শক্তিগুলি মাথা উঁচু করিবার সুযোগ পাইবে না এবং শান্তিময় ও ব্যবস্থিত পদক্ষেপের সহিত বিপ্লব আপন লক্ষ্যের দিকে নিরন্তর অগ্রসর হইতে থাকিবে।

গঠনমূলক কার্যক্রম জড়বৎ হইল কিরূপে

গান্ধীজীর এই আহ্বান গঠনকর্মী ও প্রতিষ্ঠানগুলির চিন্তায় খুব জোরেই ধাক্কা দেয়। দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ভূমিকায় তাঁহারা এক ভিন্ন দৃষ্টি লইয়া কাজ করিতেছিলেন। শোষণহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে গান্ধীজী যেভাবে গ্রাম-আন্দোলন ও বুনিয়াদী শিক্ষাকে এক সঙ্গে চালাইতে চাহিতেন (যাহাতে একে অপরের পূরক হইতে পারে), সেইভাবেই তিনি স্বাধীনতাপ্রাপ্তির জন্য যুদ্ধের ভূমিকায় অসহযোগ আন্দোলন ও গঠনকর্মকে পরস্পরের পরিপূরকরূপে চালাইতেছিলেন। এইকথা গান্ধীজী পূর্বেই দেশকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু দেশবাসী তাহা বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা প্রত্যেকটিকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে থাকেন। তাহার পরিণাম ইহাই হইয়াছিল যে, অসহযোগ আন্দোলন গঠনকর্মের দ্বারা অভীষ্ট পুষ্টি পায় নাই এবং আন্দোলনের স্রোত ও গঠনকর্মকে সম্যক রীতিতে আকর্ষিত করিতে পারে নাই। অতএব উভয়ধারাই পৃথক হইতে থাকে। ইহার ফলে জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিক্রিয়াবাদী শক্তির পঙ্কে জড়াইয়া পড়ে এবং গঠনকর্মও অচেতন হইয়া জড়বৎ হইয়া পড়ে।

প্রতিষ্ঠান ও কর্মীদের হয়রানী

সুতরাং গান্ধীজী যখন নূতন সমাজ-বিপ্লবের প্রয়োজন অনুসারে চরখা-সংঘ তথা উহার মাধ্যমে গঠনমূলক কার্যক্রমের নব সংস্করণ সম্পাদন করিতে চাহিলেন, তখন দেশের গঠনকর্মের প্রতিষ্ঠান ও কর্মীদের নিকট তাহা এক ঝঞ্ঝাট স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। গান্ধীজীর প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল বলিয়া তাঁহারা ইহাকে অস্বীকার করিতে পারিতেন না। সঙ্গে সঙ্গে কুড়ি-পঁচিশ বৎসর ধরিয়া ভিন্ন ভূমিকায় কাজ করার অভ্যাসের ফলে নব-সংস্করণের ভবিষ্যতের প্রতি তাঁহারা ভরসাও করিতে পারিতেছিলেন না। এইরূপ অবস্থায় ক্লান্ত হওয়া স্বাভাবিকই ছিল। কিছু লোক তো এই নূতন

পরিকল্পনার কার্যকারিতা ও সম্ভাবনার প্রতি সংশয়মূলক যুক্তিও উপস্থাপিত করিতে লাগিলেন।

কুড়ি-পঁচিশ বৎসরের মহান্ ত্যাগ ও অবর্ণনীয় পরিশ্রমের দ্বারা গঠনমূলক কাজের বিভিন্ন মূর্তির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। সেই সমস্ত মূর্তির প্রতি মোহ থাকাও স্বাভাবিক। গান্ধীজী যখন সেই মূর্তিগুলির বিসর্জন করিয়া নূতন মূর্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান করেন, তখন স্বভাবতঃই লোকেরা ঘাবড়াইয়া গেলেন। কিন্তু এইরূপ করার প্রয়োজন ছিল।

নবনির্মাণের জন্য বিসর্জন

ভারতবর্ষের ঐতিহ্য হইল পূজা সমাপনের পর দেব-মূর্তির বিসর্জন করা। কোন দেবতার পূজার জন্য তাঁহার অনুরূপ প্রতিমা গঠন করা হয়। মহা উৎসাহ ও একাগ্রতার সহিত সেই প্রতিমাকে সাজাইয়া সুন্দর করিয়া তোলা হয়। কিন্তু পূজা সমাপনান্তে তদনুরূপ একাগ্রতা ও উৎসাহের সহিত প্রতিমার বিসর্জনও করা হইয়া থাকে। অন্য দেবতার পূজার জন্য সেই প্রতিমাকে সুরক্ষিত রাখা হয় না। যদি রাখা হয় তবে উহা অঙ্গনের এক কোণে পড়িয়া সমস্ত পরিবার ও সমাজের অবহেলার কারণে অনাদৃত হইয়া থাকে। এই কারণেই গান্ধীজী স্বাধীনতা দেবীর পূজার জন্য যে সকল প্রতিমা গঠন করা হইয়াছিল, পূজা সমাপনের পর তাহাদের বিসর্জন দিয়া সমাজ-বিপ্লবের দেবীর অনুরূপ নূতন প্রতিমা গঠন করিতে চাহিতেন। তাই তিনি চরখা-সংঘকে শূন্য করিয়া দিবার কথাও বলিয়াছিলেন এবং পরিশেষে কংগ্রেসকেও বিসর্জন করিয়া দিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু মোহ খুব গাঢ় ছিল। কাজের ধারাও কিন্তু ভিন্ন ছিল। অধিকাংশ কর্মী তাঁহার মৌলিক বিপ্লবের বার্তা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা মনে করিলেন যে, গান্ধীজী কেবল সংস্থাগুলির সংস্কার করিতে চান।

ফলে, চরখা-সংঘ এবং খাদির অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি খদ্দরের দ্বারা সাহায্য প্রদানের কাজ বন্ধ করিয়া গ্রাম স্বাবলম্বনের আধারে কোন নির্দিষ্ট পদক্ষেপ করিতে পারিলেন না। যেভাবে আজ সরকার প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় শিল্পীকরণের কার্যক্রম অনুসরণ করার সঙ্গে সঙ্গে কোথাও কোথাও খদ্দর গ্রামোদ্যোগের কিছু প্রোৎসাহন দিতেছেন, সেইভাবে তখন খাদির প্রতিষ্ঠানগুলি প্রধানত উৎপাদন ও বিক্রয়ের কার্যক্রমের দ্বারা সাহায্য প্রদানের জন্য খদ্দর চালাইতে লাগিলেন। ইহার সহিত গান্ধীজীর নূতন পরিকল্পনার নামে কোথাও কোথাও অল্প-বিস্তর বস্ত্র-স্বাবলম্বন ও সমগ্র গ্রাম-সেবার কাজও তাঁহারা চালাইতে লাগিলেন। পরিণাম ইহাই হইল যে, খাদি ও গ্রামোদ্যোগের কাজের জন্য দেশে কোন উৎসাহ আর থাকিল না। ফলে সংস্থাগুলির মধ্যে জড়তা ও কর্মীদের মধ্যে নিরাশা দেখা দিল।

একাঙ্গী উৎসাহ

অপর দিকে, গান্ধীজীর দ্বারা বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যাপক অর্থ ব্যাখ্যা করার ফলে সমগ্র দেশে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা দিল। বহু শিক্ষিত যুবক বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। বিভিন্ন প্রদেশে এইরূপ যুবকেরা স্থানে স্থানে বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রের সংগঠন করিলেন এবং অত্যন্ত উৎসাহের সহিত নিজেদের কেন্দ্র চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও আমাদের কাজ একাঙ্গী হইয়া গিয়া বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষাকে বিস্তৃত রূপ দিয়া তাহাকে নবীন সমাজ-বিপ্লবের বাহন করিতে চাহিতেছিলেন। সুতরাং এই আন্দোলনও সমাজ-বিপ্লবের ব্যাপক পৃষ্ঠভূমিতেই প্রগতি করিতে পারিত। বাস্তবিক, গান্ধীজীর কল্পনা অনুসারে সমগ্র গ্রাম-আন্দোলনের পরিপূরকরূপেই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রগতি হইতে পারিত। কিন্তু গঠনমূলক প্রবৃত্তির মধ্যে কোন সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক পরিকল্পনার সৃষ্টি করিয়া কাজ করিবার চেষ্টা করা হইল না। গান্ধীজীর দ্বারা পরিকল্পিত

সৃজনমূলক কাজের বিভিন্ন অঙ্গ লইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কর্মীরা স্থিত হইয়া গেলেন এবং সেইগুলির দেহের সেবা করিতে লাগিলেন। মৃণ্ময় মূর্তির পিছনে চিন্ময় স্বরূপের দর্শন না থাকার জন্য এইরূপ হওয়া স্বাভাবিক।

স্বভাবতঃই সমগ্র দেশে দ্রুত গতিতে বুনিয়াদী শিক্ষার সমস্ত কেন্দ্রও একাঙ্গী হইয়া গেল এবং তাহাদের প্রগতিও বন্ধ হইয়া গেল। শিক্ষার মধ্যে অহিংস বিপ্লব সম্পাদন করিয়া গান্ধীজী সমাজের যে রূপ-পরিবর্তন চাহিতেন, সেইদিকে কোন সংগঠিত চেষ্টা হইল না। কেবল বিভিন্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের গৃহ-প্রাচীরের মধ্যে শিক্ষণ-কলার নূতন প্রণালীর প্রয়োগের মধ্যেই সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীত হইয়া গেল। এমন কি, এই শিক্ষার মাধ্যম রূপে সামাজিক পরিবেশের ব্যবহারও ব্যাপক না হইয়া প্রতিষ্ঠানগুলির আভ্যন্তরীণ সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া গেল। বুনিয়াদী শিক্ষার বিদ্যালয়গুলিকে ব্যাপক সমাজ-বিপ্লবের কেন্দ্র-বিন্দুতে পরিণত করা হইল না। ফলে এই ক্ষেত্রের কর্মীরাও উদাসীন হইয়া গেলেন।

গঠনমূলক কাজের বৈপ্লবিক দিশার প্রতি নিজেদের রূপ পরির্তন করিতে না পারার জন্য বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল না। পরিণাম ইহাই হইল যে, উহার অধিকাংশই ধীরে ধীরে সরকারী "এডুকেশন"-এর শিক্ষক তৈয়ারি করার কেন্দ্র হইয়া গেল।

গ্রামোদ্যোগ ও বুনিয়াদী শিক্ষা, উভয়েই পঙ্গু

এই ভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা সাধারণ শিক্ষণ-কলার ক্ষেত্রে অবরুদ্ধ থাকিয়া গতিহীন হইয়া গেল। সরকারের দ্বারা যে কাজ চালান হয় তাহার ব্যর্থতা তো স্পষ্টই দেখা যায়। কিন্তু আমাদের ন্যায় গঠনকর্মীরাও যাঁহারা কিছু করিতেছিলাম এবং তাহা যদিও নিষ্ঠাযুক্ত ছিল তথাপি চেতন-আত্মার অভাবে আমরা নিষ্প্রাণ হইয়া গেলাম। কেবল এইটুকুই নয়, একাঙ্গী কাজে যুক্ত থাকার ফলে আমাদের বিচার ও আচারও একাঙ্গী হইয়া গেল।

গ্রামোদ্যোগের প্রতিষ্ঠান ও উহার কর্মীদের নিকট বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি কোন আগ্রহ নাই, আবার বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ও উহার কর্মীদের মনে গ্রামোদ্যোগের প্রতি যে আগ্রহ আছে তাহা দেখা যায় না। ইহার ফলে দুইটিই পঙ্গু হইয়া যাইতেছে।

বুনিয়াদী শিক্ষার সংগঠন

বস্তুতঃ বিপ্লবের মূলতত্ত্বকে বুঝিয়া গ্রহণ না করিবার কারণে আমরা প্রত্যেক দিকেই ব্যর্থ হইলাম। সুতরাং এখন সেই সময় আসিয়াছে যখন গঠনকর্ম-প্রতিষ্ঠান ও কর্মীদের আর একবার চিন্তা করিতে হইবে এবং পুনরায় সাহস অবলম্বন করিয়া পুরাতন দৃষ্টিকোণকে তিলাঞ্জলি দিয়া গান্ধীজী ইতঃপূর্বে যে-মহান্ বিপ্লবের মন্ত্র আমাদের দিয়াছিলেন, তাহাকেই ধ্রুবতারা করিয়া আমাদের সকল কর্মসূচীকে সমগ্র বিপ্লবের ভিত্তিতে আয়োজন তথা সংগঠন করিতে হইবে। গ্রামরাজ প্রতিষ্ঠার দিশায় সমগ্র গ্রাম-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন সমাজ রচনার উদ্দেশ্যে বুনিয়াদী শিক্ষার সংগঠন করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি লইয়া পৃথক ভাবে বসিলে এই কাজ হইবে না। বরং সৃজনাত্মক বিপ্লবের সম্পূর্ণ রূপকে এক সাথে গ্রহণ করিতে হইবে। সৌভাগ্যবশতঃ আচার্য বিনোবা আমাদের সম্মুখে বিপ্লবের এক নূতন সুযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। এই সুযোগে সমগ্র দেশে ভূদান-যজ্ঞ তথা কেন্দ্রীয় শিল্প বহিষ্কারের সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার গঠনমূলক কাজকে অভিন্ন রূপে চালাইতে হইবে।